আটআনা-সংস্করণ-গ্রন্থমালার দ্বাদশ গ্রন্থ

সত্য ও মিথ্যা

[দ্বিতীয় সংস্করণ]

শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল

কার্ত্তিক, ১৩২৫

প্রকাশক—
শ্রীহরিদাস চট্টোপাধ্যায়
গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স
২০১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।

প্রিণ্টার—শ্রীবিহারীলাল নাথ,
এমারেল্ড প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্,
৯, নন্দকুমার চৌধুরীর ২য় লেন, কলিকাতা।

লাবণ্য

১

দুইদিন মাত্র আমি তাহাকে দেখিয়াছি। তার নাম যে লাবণ্য ইহাও কেবল আমার অনুমান মাত্র। প্রথম যে দিন তাহাকে দেখি, সে দিন তা'র সঙ্গিনী তা'কে "লাবী" বলিয়া ডাকিয়াছিল।

সে দু'দিনের দেখাতেই কিন্তু তার ছবিখানি মনের ভিতরে চিরদিনের মতন বসিয়া গিয়াছে। তার রং গৌর কি শ্যাম—বলিতে পারিব না। তার মুখের গড়ন কি, তাহাও জানি না। তার দেহযষ্টি যদি তোমরা আমাকে আঁকিয়া দিতে বল, আমি সুনিপুণ চিত্রকর হইলেও, তাহা আঁকিতে পারিতাম না। সে যে কেবল একটি অপূর্ব্ব ভাব-মূর্ত্তি হইয়া আমার চক্ষে ফুটিয়াছিল। মনের মধ্যে আজিও সেই মূর্ত্তিটিই জাগিয়া আছে।

তখন আমি প্রতিদিন গঙ্গাস্নান করিতাম। বৈঠকখানায় আমাদের বাসা ছিল, কয়লাঘাটে যাইয়া স্নান করিতাম। কখনও

বা সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে-সঙ্গেই স্নান করিয়া ফিরিয়া আসিতাম, কোনও দিন বা দেরী হইয়া যাইত, ৮টা ৯টার আগে বাসা হইতে বাহির হইতেই পারিতাম না।

একদিন,—তখন ফাল্গুন মাস, নূতন বসন্তের হাওয়া দক্ষিণ হইতে বহিতে আরম্ভ করিয়াছে; শীত গিয়াছে কিন্তু গরম পড়ে নাই,—এইরূপ দেরীতে স্নান করিতে চলিলাম। ভোরে গেলে, বৌবাজারের বড় রাস্তা দিয়াই যাইতাম; এ দিন কোণাকোণি চাঁপাতলার ভিতর দিয়া গেলাম।

এই পল্লীর এক দুতালা বাড়ী হইতে দুইটি স্ত্রীলোক আমার আগে-আগে গঙ্গাস্নান করিতে যাত্রা করিল। দেখিয়া কেমন একটা কৌতূহল হইল,—ইহারা আবার গঙ্গাস্নান করিতে যায় কেন? লোকমুখে শুনিয়াছিলাম ইহাদের গঙ্গাস্নান একটা লোক-সংগ্রহের ফন্দি মাত্র। কথাটা মনে পড়িল। ইহাদের গতিবিধি পরীক্ষা করিতে ইচ্ছা হইল। ইহাদের কথা-বার্ত্তা শুনিবার জন্য পেছনে-পেছনে চলিলাম।

স্ত্রীলোক দুটিই পূর্ণ যুবতী, দেখিতেও সুন্দরী। গড়নটি দু'জনারই সুগোল, সুঠাম। একবার, কেন জানি না, দু'জনাই মুখ ফিরাইয়া পশ্চাতের দিকে চাহিল। দেখিলাম, রূপসী বটে। আর, একটির মুখে রূপের চাইতেও লাবণ্য বেশী। দেখিয়া মনটা একটু নরম হইল।

ইহাকে সম্বোধন করিয়া, তাহার সঙ্গিনী বলিল—"হাঁ লো লাবী, বাড়ীওয়ালি তোরে কাল অমন করে বক্‌ছিল কেন?"

"দু মাসের ঘরভাড়া পড়ে আছে। তার আর দোষ কি? ঐ দিয়েই ত তারও দিন চালাতে হয়।"

"দু-বছর ভাড়া গুণে এসেছিস্, তাতে আর এক মাস দু'মাস কি সবুর সয় না? তার জন্য অত বকাবুকি কেন? আমি ভাই অত সইতে পারি না।"

"তা কি কর্‌ব, ভগবান্ যখন যা দেন, তাই সইতে হয়।"

"তোর ভগবান্ তোরে একটা ভাল বাবু জুটিয়ে দেন না কেন? তা হ'লেই ত সব গোল মিটে যায়। তোর ত রূপের অভাব নাই।"

"লাবী" ইহার কোনও উত্তর দিল না। খানিক পরে তার সঙ্গিনী আবার কহিল—"আর ভগবানেরই বা দোষ দেই কিসে। তুই ত দিনরাত ঘরের কোণেই ব'সে থাকিস্। নইলে তোর ভাবনা ছিল কি? এত দিনে তুই আপনি অমন দু'চারখানা বাড়ী কর্‌তে পার্‌তিস্।"

"লাবী" কোনও কথা কহিল না। মাথা হেঁট করিয়া নীরবে পথ চলিতে লাগিল। মনে হইল যেন কাঁদিতেছে। পাশ কাটাইয়া একটু অগ্রসর হইয়া, ফিরিয়া চাহিয়া দেখিলাম, মুখখানি দৈন্যে মুয়াইয়া পড়িয়াছে, আর আনত-পক্ষ্ম চক্ষুদুটি হইতে দুই

বিন্দু অশ্রু গড়াইয়া পড়িতেছে। দেখিয়া প্রাণটা কেমন করিয়া উঠিল। চোখে পথ দেখিয়া চলা ভার হইল। রাস্তার পাশে একখানা গাড়ী দাঁড়াইয়াছিল, তাহাতে উঠিয়া বলিলাম "বৈঠকখানা চল্।"

২

বহু দিন ঐ মুখখানি যেন আমার চিত্তে লাগিয়া রহিল। কতবার দেখিতে সাধ গিয়াছে, আবার কি জানি যদি দেখিতে পাই, এই ভাবিয়া ভয়ে প্রাণ শুকাইয়াও গিয়াছে। ঐ ভয়েই ঐ পথে গঙ্গাস্নানে যাওয়া ছাড়িয়া দিলাম। কিন্তু যখনই পথে-ঘাটে কোনও স্ত্রীলোকের মুখ দেখিতাম, তখনই ঐ মুখখানি প্রাণের মধ্যে জাগিয়া উঠিত। ঐ মুখে সে দিন যে ট্রেজেডির ছায়াপাত দেখিয়াছিলাম, তার রহস্য-ভেদ করিবার জন্যও মাঝে-মাঝে মনটা একান্ত উৎসুক হইয়া উঠিত। কিন্তু তার সঙ্গে আলাপ-পরিচয় করা সাহসে কুলাইল না;—সমাজের ভয়েও পারিলাম না, তার ভয়েও পারিলাম না।

৩

দুই বৎসর পরে আমার ৺গুরুদেব আবার কলিকাতায় আসিলেন। তাঁর কাছে প্রায়ই যাইতাম। গুরুভাইয়া অনেকেই যাইতেন। দু'-একটি তাঁর সঙ্গেই থাকিতেন। ইঁহাদের মধ্যে

একজন কাশীতে যাইয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছিলেন। তখন তিনি নবীন যুবক। দ্রঢ়িষ্ঠ, বলিষ্ঠ দেহ হইতে যেন ব্রহ্মচর্য্য ফাটিয়া পড়িতেছে। অপূর্ব্ব গৌরকান্তি; সুগোল, সুঠাম গঠন; আকর্ণায়ত চক্ষু দুটি যেন সর্ব্বদা ভাবে ঢল ঢল থাকিত; বয়সে কনিষ্ঠ হইলেও সাধন ভজনে আমরা তাঁহাকে জ্যেষ্ঠের মতনই ভক্তি করিতাম। আদর করিয়া আমরা তাঁহাকে গোরা বলিয়া ডাকিতাম। গুরুদেব চিরদিনই তাঁহাকে 'ব্রহ্মচারী' বলিয়া ডাকিতেন। গুরুদেব চাঁপাতলার নিকটেই বাসা করিয়াছিলেন। আমাকে প্রতিদিন সেই যুবতীদিগের বাড়ীর সম্মুখ দিয়াই তাঁহার কাছে যাইতে হইত। আর মাঝে-মাঝে সেই মুখখানি মনে হইয়া, প্রাণটা চঞ্চল হইয়া উঠিত।

একদিন রবিবার, প্রাতে ৯টার সময়, গুরুদেবের শ্রীচরণ দর্শনে যাইতেছিলাম। হঠাৎ ঐ বাড়ীর সম্মুখে আসিয়া, অপূর্ব্ব, উন্মত্ত কীর্ত্তন হইতেছে শুনিয়া, থমকিয়া দাঁড়াইলাম। এই পল্লিপথে যাইতে যাইতে রসকীর্ত্তন মাঝে মাঝে শুনিয়াছি, টহলিয়া বৈষ্ণবেরা বাড়ীতে-বাড়ীতে নামকীর্ত্তনও করে, জানি। কিন্তু এ কীর্ত্তন যে অন্য ভাবের! এ ত কেবল গলার সুর নয়,—এ কীর্ত্তনে প্রাণটা যেন গলিয়া তরল হইয়া বাহির হইয়া, বাষ্প হইয়া, বায়ু-সাগরে মিশিয়া, উর্দ্ধতম স্বর্গলোকে প্রাণেশ্বরের পানে হিল্লোলে-হিল্লোলে ছুটিয়া, উড়িয়া যাইতেছে।

এ গান, অমন করিয়া, এখানে গায় কে? দুইজনে গাহিতেছে,—একটি সুর সরু, একটি মোটা। দুই সুরে কি অপূর্ব্ব সঙ্গতই না মিলিয়াছে! হঠাৎ একটা সুর শুনিয়া চমকিয়া উঠিলাম। এ'ত অপরিচিত নয়! পথে লোক দাঁড়াইয়া গেল। আমিও চিত্রার্পিতের ন্যায় দাঁড়াইয়া শুনিতে লাগিলাম। ক্রমে কীর্ত্তন আরও মাতিয়া উঠিল। খোলের তালে-তালে যেন উদ্দাম নৃত্য হইতেছে, মনে হইতে লাগিল। আর বাহিরে থাকিতে পারিলাম না। দরজা ভেজান ছিল, অঙ্গুলিস্পর্শে খুলিয়া গেল। বাড়ী ঢুকিয়া দেখিলাম, সেই "লাবী" অধোবদনে গান গায়িতেছে, তার মুখখানি যেন মাটিতে লুটাইতেছে, চোখের জল টস্‌টস্ করিয়া মাটীর উপরে পড়িতেছে,—মনে হইল সমগ্র প্রাণটাও যেন ঐ মাটীতে মিশিয়া যাইতেছে। তার সেই সঙ্গিনী করতালে তাল দিতেছে। একটি বৈষ্ণব খোল বাজাইতেছে! আর "গোরা" "লাবীর" সঙ্গে সঙ্গে গাহিতেছে—

তুহুঁ দীনদয়াল, দীনবন্ধু!
তুহুঁ দীনদয়াল, দীনবন্ধু!—

আর বাহু তুলিয়া, উদ্দাম নৃত্য করিতেছে।

৪

পরদিন প্রাতঃকালে গুরুদেবের শ্রীচরণ দর্শনে গেলে, তিনি বলিলেন—"আজ রাত্রে আমার এখানে আসিয়া আহার করিবে। বাড়ী ফিরিয়া না গেলে যদি অসুবিধা না হয়, এখানেই শুইয়া থাকিবে। আমার ঘরেই তোমার জন্য একটা বিছানা করিয়া রাখিতে বলিব।"

গভীর রাত্রে জাগিয়া দেখি গোরা গুরুদেবের পা জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিতেছে, আর তিনি নিমীলিত-নেত্রে ভাবাবিষ্ট হইয়া তার পিঠে হাত বুলাইতেছেন। একটু শান্ত হইলে বলিলেন—"ব্রহ্মচারী, কাল্‌কের বৃত্তান্তটি আদ্যোপান্ত বল।" আমাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন—"এই কথা শুনিবার জন্যই আজ তোমাকে নিমন্ত্রণ করিয়াছি।"

ব্রহ্মচারী বলিলেন—(তাঁর কথা ঠিক পুনরুক্তি করা আমার পক্ষে অসাধ্য, তবে তার মর্ম্মটুকু এই)—"আমি কাল প্রাতে গঙ্গাস্নানে যাইবার সময় দুটি স্ত্রীলোককে দেখি। তারাও গঙ্গা-স্নানে যাইতেছিল। দেখিয়াই আমার মনটা চঞ্চল হইয়া উঠিল। তাদের একজনার মুখখানি বড় মিষ্টি লাগিল। আমি তাদের সঙ্গে-সঙ্গে গঙ্গার ঘাটে গেলাম। তাড়াতাড়ি গঙ্গায় নামিয়া সংক্ষেপে স্নানাহ্নিক সারিয়া, তাদের প্রতীক্ষায় তীরে দাঁড়াইয়া রহিলাম। তারা যখন ফিরিল, আমিও তাদের পশ্চাৎ-

পশ্চাৎ ফিরিলাম। ক্রমে তারা নিজের বাড়ীতে ঢুকিল, আমি তাদের দ্বার পর্য্যন্ত আসিয়া থমকিয়া দাঁড়াইলাম। এক-বার সেখান হইতে ফিরিয়া আসিলাম। আবার গেলাম। আবার ফিরিয়া আসিলাম। তখন অনেক দূর চলিয়া গেলাম। কিন্তু আবার ফিরিয়া আসিলাম। এবার তাদের বাড়ী ঢুকিয়া পড়িলাম। তারা আরও তিন-চারিটি স্ত্রীলোকের সঙ্গে বারান্দায় বসিয়াছিল। আমাকে দেখিবামাত্র সসম্ভ্রমে উঠিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিল। একজন একখানা কুশাসন আনিয়া আমাকে বসিতে দিল। গঙ্গাস্নানে যাইবার সময় যাহাকে দেখিয়া আমার চিত্ত চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিল, আমি কুশাসনখানা সরাইয়া তার একটু কাছ ঘেঁসিয়া বসিলাম। চাহিয়া দেখি, তার মুখখানি জবাফুলের মত লাল হইয়া উঠিয়াছে, চোখ দুটি মাটিতে নুঙাইয়া পড়িয়াছে; শরীর মৃদু কাঁপিতেছে। আমি মনে করিলাম, আমারই মত তারও হৃদয়ে অনুরাগের উদ্রেক হইয়াছে। আমি তার হাতখানি ধরিতে গেলাম, সে সরিয়া গেল। আমি বলিলাম, "আমি একেবারে ভিখারী নই। এই দশটি টাকা আমার কাছে আছে।" সে, অঝরঝরে কাঁদিতে লাগিল, ফুঁপাইয়া-ফুঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিল। তখন তার সঙ্গিনী আসিয়া হাতজোড় করিয়া বলিল—"আমাদের ক্ষমা করুন। আমরা পতিতা। পাপ ব্যবসা করিয়া দিন কাটাই। কিন্তু আমরা নিজেদের ধর্ম্ম নষ্ট করিয়াছি বলিয়া,

আপনার ধর্ম্ম নষ্ট করিতে পারিব না। আপনি আমাদের দেবতা, আপনার পা ছুঁইবার আমরা যোগ্য নই। আপনি আমাদের এ পাপগৃহকে পায়ের ধুলা দিয়া আজ পবিত্র করেছেন। আপনি বসুন, আমরা আপনার পায়ের তলে বসিয়া ঠাকুরের নাম করি, শুনুন।" এই বলিয়া একজনকে খুলি ডাকিতে পাঠাইল; নিজে করতাল লইয়া আসিল; আর এক জনকে হারমোনিয়াম আনিতে বলিল। খুলি বুঝি কাছেই থাকে। করতাল, হারমোনিয়াম আনিতে আনিতে সেও আসিয়া উপস্থিত হইল। তখন সেই স্ত্রীলোকটি গান ধরিল—

গৌরাঙ্গ বলিতে হবে পুলক শরীর।
হরি হরি বলিতে নয়নে বহে নীর॥
আর কবে নিতাইচাঁদ করুণা করিবে।
সংসারি-বাসনা মোর কবে তুচ্ছ হবে॥
বিষয় ছাড়িয়া কবে শুদ্ধ হবে মন।
কবে হাম হের্‌ব সেই শ্রীবৃন্দাবন॥
রূপ রঘুনাথ বলি হইবে আকুতি।
কবে হাম বুঝ্‌ব সে যুগল পিরীতি॥
রূপ রঘুনাথপদে রহু মোর আশ।
প্রার্থনা করয়ে সদা নরোত্তম দাস॥

আরও দু'তিন জন এই গানে যোগ দিল। আমি লজ্জায়

মরিয়া যাইতে লাগিলাম। এতদিন সাধনভজন করিয়া শেষে গণিকার মুখে ধর্ম্মোপদেশ পাইতে হইল। মনে হইল, সকলি বৃথা। মান গেল, ধর্ম্ম গেল, এ জীবন আর রাখি কেন? এরূপ ভাবিতে লাগিলাম। ইহাদের গান শেষ হইলে, অধোমুখে উঠিয়া আসিতেছি, এমন সময় সে গাহিতে লাগিল—প্রথমে গুন্-গুন্ করিয়া, শেষে আত্মহারা হইয়া, গলা ছাড়িয়া, প্রাণ-ঢালিয়া গাহিতে লাগিল—

মাধব বহুত মিনতি করি তোয়,
দিয়া তুলসী তিল, দেহ সঁপিনু
দয়া নাহি ছোড়বি মোয়॥

গণইতে দোষ, গুণলেশ না পাওবি,
যব তুহুঁ করবি বিচার।
তুহুঁ জগন্নাথ, জগতে কহায়সি,
জগ বাহির নহি মুঁই ছার॥

কিয়ে মানুষ পশু, পাখী হয়ে জনমিয়ে
অথবা কীট পতঙ্গ।
করম বিপাকে গতাগতি পুন পুন
মতি রহু তুয়া পরসঙ্গ॥

আবার ধরিল—

তাতল সৈকত বারিবিন্দুসম
　　স্তমিত রমণী-সমাজে।
তোহে বিসরি, মন তাহে সমপিল
　　অব মঝু হব কোন কাজে॥
　　মাধব হম পরিণাম নিরাশা।
তুহুঁ জগতারণ, দীন দয়াময়,
　　অতএ তোহারি বিশোয়াসা॥

এইখানে আসিয়া তার গানের পদ ফুরাইল; কেবল প্রাণপণে 'তুমি দীনদয়াল, দীনবন্ধু' বলিয়া ডাকিতে লাগিল। তার পরে কি হইল আমার মনে নাই। অনেক রাত্রে জাগিয়া দেখি—এখানে, এই বাড়ীতে, নিজের বিছানায় শুইয়া আছি।"

গুরুদেব আমার মুখের দিকে চাহিলেন। আমি যাহা-যাহা যেরূপ দেখিয়াছিলাম, বলিলাম। গোরা কখন চলিয়া আসিয়াছিলেন, আমি জানি না। কিরূপে কখন বাড়ী ফিরেন, তাও জানি না। শুনিলাম, পথে অজ্ঞান হইয়া পড়িয়াছিলেন। একটি গুরুভাই তাঁহাকে ঐ অবস্থায় দেখিয়া গাড়ী করিয়া লইয়া আসেন।

গোরা বলিল—"ঠাকুর, আমার এ দুর্গতি হইল কেন?"

গুরুদেব বলিলেন—"তোমার বহুভাগ্যবলে এটি হইয়াছে। তুমি এ সকল স্ত্রীলোককে বড় ঘৃণা করিতে। ভগবান্ তাই তোমার দর্প চূর্ণ করিলেন। মানুষমাত্রকেই যে ভক্তি করিতে না পারে, অন্য ধর্ম্মকর্ম্ম, তার যাই হউক না কেন, সে কখনও ভগবান্‌কে পায় না।"

গোরার কাণে এ কথা গেল কি না, বুঝিলাম না। সে আরও আকুল হইয়া বলিল—"আমার সকলই নষ্ট হইল। এই মন লইয়া এই ভেক আমি রাখি কেমন করিয়া?"

গুরুদেব বলিলেন—"ভয় নাই, ব্রহ্মচারী, ভয় নাই। ভগবানের রাজ্যে কিছুই বিফলে যায় না। একটিও সাধু-ইচ্ছা নষ্ট হয় না। সময়মতে তার ফল ফলেই ফলে। তোমার সাধন-ভজন ত বাস্তবিক বিফলে যায় নাই। যাকে দেখিয়া তোমার চিত্তবিকার উপস্থিত হইয়াছিল, সে ত সামান্য ব্যক্তি নয়। ইহার ভিতরে যে বস্তু বাস্তবিক তোমার প্রাণকে স্পর্শ করিয়াছিল, কাম তাহাকে সহজেই নষ্ট করিতে পারে, কিন্তু কোনও দিন সৃষ্টি করিতে পারিত না; সামান্য রক্তমাংসের টানে তোমাকে টলাইতে পারিত না। আর এ ধাক্কা খাওয়া তোমার প্রয়োজন ছিল। তুমি সন্ন্যাস লইয়া স্বভাবকে শুদ্ধ করার চাইতে রুদ্ধ করার দিকেই বেশী ঝুঁকিয়া পড়িয়াছিলে। তাই তোমার প্রকৃতি এই প্রতিশোধ তুলিয়াছে। ও-পথের অসারতা দেখাইতেই ভগবান্

তোমার এই দশা ঘটাইয়াছেন। যে আঁধারে তোমাকে আজ ঘেরিয়াছে, তারই ভিতর হইতে সত্যের আলো ফুটিবে। সেই আলোতে তুমি সাধন-পথ খুঁজিয়া পাইবে। আর সে-পথে এই রমণীই তোমার গুরু হইবেন। আজ হইতে তুমি নামের সঙ্গে ইহার রূপ জড়াইয়া লইবে ঐ রূপেতেই তোমার সিদ্ধিলাভ হইবে।”

লণ্ডনে নন্দনলাল

১

নন্দনলাল যখন লণ্ডনে গিয়া পৌঁছিল, তখন সন্ধ্যা। আকাশে মেঘ ছাইয়া আছে। গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি পড়িতেছে। ষ্টেশন ধুঁয়ায় আচ্ছন্ন হইয়া তাহার শ্বাসরোধ করিবার চেষ্টা করিতেছে। প্রথম পরিচয়ে বিলাতটা তার আদৌ ভাল লাগিল না।

সে ভাবিয়াছিল কেউ না কেউ আসিয়া তাকে ষ্টেশন হইতে লইয়া যাইবে। তার বাবা বড় চাকু'রে। লাট বেলাটের দরবার করেন। ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের সঙ্গে খুব খাতির। সাহেব তাঁর অনেক বিলাতী বন্ধুকে চিঠি লিখিয়াছেন। একজন বৃদ্ধ পেন্সন-প্রাপ্ত সিভিলিয়নকে তিনি নন্দনের অভিভাবক পর্য্যন্ত করিয়া দিয়াছেন। নন্দন ভাবিয়াছিল, অন্ততঃ তিনি তাকে ষ্টেশন হইতে লইয়া যাইবেন। কিন্তু কেহই আসে নাই, সেই লোকারণ্যের ভিতর, সেই কোলাহল ও ব্যস্ততার মধ্যে, নন্দন কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। প্রাণটা তার কাঁদিয়া উঠিল। চক্ষু ছল

ছল করিতে লাগিল। ইচ্ছা হইল, বিধাতা যদি পাখা দিতেন, তবে তখনি উড়িয়া আবার আপনার জনের মাঝখানে যাইয়া পড়ে।

"গুড্ ইভ্নিং। আপনি কি এই গাড়ীতে, এই মাত্র দেশ হইতে আসিয়া পৌছিয়াছেন?"—সুললিত বামাকণ্ঠনিঃসৃত স্বাগত সম্ভাষণ-নন্দনের নিস্পন্দ ধমনীতে প্রবলবেগে রক্তস্রোত ছুটাইয়া দিল। সে চাহিয়া দেখিল এক অনিন্দ্যরূপবতী উদ্ভিন্ন-যৌবনা রমণী তাহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া। রমণী তাহারই প্রতি চাহিয়া তাহাকেই সম্ভাষণ করিতেছেন। কিন্তু নন্দন তো তাকে চিনে না। নন্দনকে সে চিনিল কেমন করিয়া? এ স্বপ্ন না সত্য? নন্দনকে নির্ব্বাক্ দেখিয়া রমণী বলিল—"আপনার জিনিষপত্র কোথায়? গাড়ীর ভিতরে তো কিছু প'ড়ে নাই?" এই বলিয়া গাড়ীটা খুঁজিতে গেল। নন্দন আপনার ছোট হাত ব্যাগটা ফেলিয়া আসিয়াছিল। রমণী সেটী আনিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"এ ব্যাগ্ তো আপনারই?"

তখন নন্দনের চমক ভাঙ্গিল। অর্দ্ধস্ফুট স্বরে সে বলিল—"এ্যাঁ—এ্যাঁ—আপনি আমায় চিন্‌লেন কেমন করিয়া?"

"তা কি বড় একটা আশ্চর্য্যের কথা? আমি আপনার দেশের অনেক লোককে চিনি। অনেকেই আমার বন্ধু। আপনাকে কেই নিতে আসে নি দেখে আপনার কাছে ছুটে

এসেছি।" রমণী ঈষৎ হাসিয়া দন্তরুচি-কৌমুদী বিস্তার করিয়া, নন্দনের মনের ধোঁকা দূর করিবার প্রয়াস পাইলেন।

"আপনার আরো বাক্সটাক্স তো আছে? এদিকে আসুন, সেগুলি কষ্টম্ থেকে খালাস করে নেওয়া যাক্ গে।"

মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় নন্দন তাঁহার পশ্চাতে চলিল। রমণী বলিলেন—"বাক্সের চাবিগুলো তো চাই; ডিউটিএব্‌ল্ (Dutiable) কোনও কিছু বাক্সে নাই তো?"

"তা তো জানি না।"

"সোণারূপার অলঙ্কার বা প্লেট, তামাক কি চা—এ সকল থাক্‌লেই খুলে দেখাতে হবে।"

"না—ও সব আমার বাক্সে কিছুই নাই।" এই বলিয়া নন্দন রমণীর হাতে চাবির গোছা তুলিয়া দিল।

"তা হ'লে আর চাবির দরকার হবে না। আমাদের এখানে কষ্টমের এমন কড়াকড়ি নাই।" রমণী ক্রমে নন্দনের তৈজসপত্র সংগ্রহ করিয়া, মুটের জিম্মা করিয়া, গাড়ী ডাকিতে লাগিলেন। জিনিষগুলো গাড়ীতে তোলা হইলে, জিজ্ঞাসা করিলেন,—"যাবেন কোথায়, ঠিক আছে কি? কেউ তো আপনাকে নিতে আসে নি দেখ্‌ছি।"

"তাইতো দেখ্‌ছি। কোথায় যাব বুঝ্‌তে পাচ্ছি না।"

"তবে আমাদের ওখানে আসুন। সেখানে আপনার

স্বদেশী লোক অনেক আছেন, নিজের বাড়ীর মতন থাক্‌তে পাবেন।”

নন্দন, কি জানি, কি হয়, ভাবিয়া ইতস্ততঃ করিতে লাগিল।

“এই যে মিঃ দাস আস্‌ছেন?” বলিয়া রমণী একজন আগন্তুক ভারতবাসীকে ডাকিলেন।

“হাঁ গো! দাস, তুমি তো আচ্ছা লোক; তোমার দেশের একটী ভদ্রলোক এই লণ্ডনের মরুভূমে একা পড়েছিল, কোথায় যাবেন জানেন না, কেউ তাঁকে নিতে আসে নি। আর তুমি পাশ কাটিয়ে চলে যাচ্ছ!” আগন্তুক টুপি খুলিয়া রমণীকে অভিবাদন করিয়া বলিলেন—“মাপ কর্‌বেন। আমি আন্‌মনে যাচ্ছিলাম। তা, আপনি কি এই গাড়ী থেকে নামলেন?”

স্বদেশীর মুখ দেখিয়া নন্দনের ধড়ে প্রাণ আসিল। বলিল—“হাঁ, এই আজকের বোট্‌ট্রেণে এসে পৌঁছেছি।”

“কোথাও যাবার ঠিকানা আছে কি?”

“আপাততঃ তো দেখ্‌ছি নাই, স্যার জেমস্‌ ম্যাকিণ্টসের নিকট চিঠি লেখা হয়েছিল। টেলিগ্রামও করেছিলাম। ভাবছিলাম তিনি বুঝি কোনও ব্যবস্থা করিবেন।”

দাস একটু বিদ্রূপের হাসি হাসিয়া বলিল—“তা বৃষ্টি তো এত পড়ছে না যে ম্যাকিণ্টসের দরকার হবে। আপনি আমার সঙ্গেই চলুন। আমার বাড়ীতেই থাক্‌বেন।”

রমণী বলিল—"দাস, তুমি পাগ্‌লামো করো না। তোমার ওখানে নিয়ে গিয়ে বেচারীর পেছুনে এখন থেকেই পুলিশ লাগাবে কেন? দুদিন সবুর কর না, তোমাদের দলে তো মিশবেই। তবে স্যার জেমস্ ম্যাকিণ্টস কি ব্যবস্থা করেন, তাই দেখ না?" তারপর নন্দনের দিকে চাহিয়া বলিল—"স্যার জেমস্ ম্যাকিণ্টসের সঙ্গে আপনার পরিচয় হ'ল কি করে?"

"আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ পরিচয় নাই, আমার বাবার সঙ্গে খুবই আছে।"

"আপনার বাবা করেন কি?"

"সদরালার কাজ করেন।"

"সদরালা!—দাস, সদরালা কাকে বলে?"

"সদরালা একজন বড় জুডিসিয়াল অফিসার।"

"আর তুমি তাঁর ছেলেকে তোমার ওখানে নিতে চাও? বাপ বেটা দুজনার সর্ব্বনাশটা কেন কর্ব্বে, দাস?"

"আপনি কোথায় থাকেন, দাস মহাশয়?"

"হাইগেটে ইণ্ডিয়া হাউসে—শ্যামাজি কৃষ্ণবর্ম্মার আড্ডা—কথাটা খুলেই বল না কেন, দাস!"

নন্দনের বাবা তাহাকে ইণ্ডিয়া হাউসের ছায়া মাড়াইতে দু'শবার বারণ করিয়া দিয়াছিলেন। তার মুখ শুকাইয়া গেল। দাসও বেচারীর মনোভাব বুঝিতে পারিলেন; ঈষৎ হাসিয়া

বলিলেন—"তা আপনি এঁরই সঙ্গে যান। সেখানে অনেক বাঙালী, বেহারী, পঞ্জাবী ছেলে আছে। তার পরে যা' পাকা বন্দোবস্ত কর্ত্তে হয়, করিয়া লইবেন। আবার দেখা হবে।"

দাসের কথায় নন্দনের ভয় কমিয়া গেল। রমণীর সঙ্গে যাইয়া "ভারতকুঞ্জে" লণ্ডন প্রবাসের প্রথম রাত্রি কাটাইলেন।

২

"মেরী, আমায় এখান থেকে যেতে হলো দেখ্‌ছি।"

"কেন নন্দন, এখানে কি তোমার কোন অসুবিধা হচ্ছে?" নন্দনের দুই কাঁধে হাত দু'খানি রাখিয়া মেরী কাতর নয়নে জিজ্ঞাসা করিল।

"তা নয়, মেরী। লণ্ডনে পৌছিয়া অবধি তুমি যে স্নেহমমতা দিয়াছ, তাতে আমার এ প্রবাস তো একদিনও প্রবাস বলে ঠেকে নি। কিন্তু কি করি বাবা যে তাড়া দিচ্ছেন।"

"এটা তো আর ইণ্ডিয়া হাউস নয়, এখানে সব বড় বড় সাহেব সুবোরা আসেন, এখানে থাক্‌তে তোমার বাবার এত আপত্তি হবে কেন? স্যার জেম্‌স্‌ও তোমাকে এখানে দেখে গেছেন।"

"কথাটা তা ত নয়। বাবা বল্‌ছেন একটা ফ্যামিলিতে

গিয়ে থাকৃতে। আর স্যার জেম্‌স্‌ সে পরিবার ঠিক করে দিবেন।”

“যদি তুমি তাতে রাজি না হও ?”

“রসদ বন্ধ হবে।”

মেরীর মুখখানি ভারী হইয়া গেল! এই ক’মাসে নন্দনের সঙ্গে তার কি যেন একটা কেমনতর সম্বন্ধ জমাট বাঁধিয়া উঠিতেছিল। আজ থিয়েটার, কাল মিউজিক হল, পরশু আর্লস্‌ কোর্টের একজিবিষণ, আর এক দিন সেপার্ডসবুশের জাপানী মেলা, এই রকমে আমোদ আহ্লাদে, খাইয়া দাইয়া, ঘুরিয়া বেড়াইয়া, দু’জনার দিনটা কাটিয়া যাইতেছিল। নন্দন এক আধ খানি অলঙ্কারও মেরীকে উপহার দিয়াছে। একদিন হয়ত নন্দনের সঙ্গে একটা পাকাপাকি সম্বন্ধ বাধিয়া যাইতে পারে, মেরী এ কথাটাও কখনও কখনও হয়ত ভাবিতেছিল। মেরীর মা বাপেরও তাহাতে আপত্তি হইত না। তারা বড় গরিব। অনেকগুলি ছেলেপিলে, ডাইনে আনিতে বাঁয়ে কুলাইত না; আর ভারতবাসীরা তাদের কল্পনায় এক একটী ছোট বড় ধনকুবের। নন্দনকে মেরী দু’চার দিন তার নিজের বাড়ীতেও লইয়া গিয়াছে। নন্দনের বড়মানুষী চালচলন দেখিয়া বুড়াবুড়ির একটু চটকও লাগিয়াছিল। মেরীর সকল আশা গড়িতে না গড়িতে যেন সহসা ভাঙ্গিয়া পড়িতে লাগিল।

নন্দন মেরীর ডান হাতখানি আপনার হাতে লইয়া আপনার আঙ্গুল দিয়া তার তর্জ্জনীর অগ্রভাগ ধীরে ধীরে খুঁটিতে খুঁটিতে মাথা নীচু করিয়া বলিল—"মেরী, আমায় কালই যেতে হবে যে। ম্যানেজারকে নোটিস দেই নাই বলিয়া এক সপ্তাহের বিল্ল আগাম চুকাইয়া দিয়াছি। আমি চ'লে গেলে তোমার কষ্ট হবে মেরী?" নন্দন একটু আদর বাড়াইবার জন্য জিজ্ঞাসা করিল।

মেরী আর আপনাকে সাম্‌লাইতে পারিল না। নন্দনের বুকে মাথা রাখিয়া ফুঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিল। নন্দনও আপনাকে সাম্‌লাইতে পারিল না! এই দু' মাস কাল যা করে নাই, আজ তাই করিয়া ফেলিল। মেরীকে বুকে টানিয়া ধরিয়া তার ঠোঁটে, চোখে, কপোলে ঘন ঘন চুম্বন-বৃষ্টি-করিতে লাগিল!

সহসা নন্দনের ঘরের দরজা সশব্দে খুলিয়া গেল। স্যার জেম্‌স্ ম্যাকিণ্টস্ ঘরে ঢুকিয়া এই উন্মাদ অভিনয় দেখিলেন।

নন্দন ও মেরী সন্ত্রস্ত হইয়া উভয়ে উভয়ের নিকট হইতে সরিয়া গিয়া অধোমুখে চিত্রার্পিতের ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিল।

ক্ষণিক পার স্যার জেম্‌স্ বলিলেন—"নন্দন, তুমি কি আমায় বস্‌তে বল্‌বে না?" "বস্‌বেন বৈ কি? বস্‌তে আজ্ঞে হ্য়, আমায় ক্ষমা কর্ব্বেন, স্যার জেম্‌স্। বড় অপরাধ হয়েছে!"

"তুমিও বস। আমার কথা আছে।" এই বলিয়া স্যার জেম্‌স্‌ মেরীর দিকে চাহিলেন। মেরী তাঁহার চাহনির অর্থ গ্রহণ করিতে পারিল না; স্যার জেম্‌স্‌ অগত্যা মুখ ফুটিয়া বলিলেন— "মিস্‌, নন্দনের সঙ্গে আমার কিছু কথা আছে।" তথাপি মেরীর মুখে কথা নাই। ফ্যাল্‌ ফ্যাল্‌ করিয়া সে তাঁর মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। স্যার জেম্‌স্‌ তখন মেরীর কাছে যাইয়া; তাহার দুই বাহু ধরিয়া খুব জোরে তাহাকে ঝাঁকুনি দিয়া, মুখের কাছে মুখ দিয়া বলিলেন—"ইয়ং উওম্যান (young woman!) শুনতে পাচ্ছ না? নন্দনের সঙ্গে আমার কথা আছে। তোমায় এখন এ ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে হবে।"

মেরী পূর্ব্বের ন্যায় নির্ণিমেষ শূন্য দৃষ্টিতে স্যার জেম্‌সের মুখের দিকে তাকাইয়া ক্ষণিক হঠাৎ হোঃ হোঃ করিয়া অট্ট হাসি হাসিয়া হাততালি দিয়া দ্রুতবেগে ঘরের বাহির হইয়া গেল।

স্যার জেম্‌স্‌ দরজা বন্ধ করিয়া আপনার আসনে আসিয়া বসিলেন। একটু পরে বলিলেন—"নন্দন, ব্যাপারখানা কি বল দেখি? এ সবের জন্যই কি তোমার বাপ তোমায় বিলাত পাঠিয়েছে। লণ্ডন সহরের অনেক কুলটা বাসাড়ে বাড়ীতে বাড়ীওয়ালী ও চাকরাণী বেশে বাস করে। তুমি শেষটা তাদেরই খপ্পরে পড়্‌লে?"

নন্দনের চোখ মুখ লাল হইয়া উঠিল! একটু উত্তেজিত হইয়া সে উত্তর করিল—"অমন কথা বল্‌বেন না, স্যার জেম্‌স্। আপনি আমার বাবার বন্ধু, পিতৃস্থানীয়। কিন্তু আপনার মুখেও আমি এই ভদ্রমহিলার অযথা নিন্দাবাদ সহিতে পারিব না।"

স্যার জেম্‌স্ একটু নরম হইলেন। "তবে কি তুমি তার নিকটে বিবাহ প্রস্তাব করেছ?"

"করিনি। কিন্তু ভবিষ্যতে করিতে পারি।"

"তোমার নিজের স্থান ভুলে যেও না, নন্দন। যেখানকার লোক তুমি তোমার সেখানেই থাকা কর্ত্তব্য। ভু'ল না তুমি নেটিভ্, সে ইংরেজ।"

"আপনিও ভুলে যাচ্ছেন স্যার জেম্‌স্, এটা বেহার নয় বিলাত। আপনাকে আমার এ সব কথা বলা সাজে না। কিন্তু আপনি বল্‌ছেন। আমি ইংরেজ কুলটার খপ্পরে পড়ে সর্ব্বস্বান্ত হই, ইয়ং রাস্‌কেল বলে তা উপেক্ষা কর্ত্তে পারেন, কিন্তু ইংরেজ ভদ্র-কন্যার পাণিগ্রহণ করি ইহা সহ্য কর্ত্তে পারেন না! আর আমরাই কেবল জাত মানি!"

স্যার জেম্‌সের কর্ণমূল পর্য্যন্ত সান্ধ্যগগনের সিন্দুরে মেঘের মত আরক্তিম হইয়া উঠিল।

"দুদিনেই তুমি এতটা বেয়াদব হয়ে উঠেছ, তা ভাবি নাই। ভাবুলে তোমার এখানে আস্‌তাম না। তুমি গোল্লায় যাবে,

যদি পণ করে থাক, তবে তোমাকে বাঁচানো আমার পক্ষে দুঃসাধ্য।"

"বেয়াদবি হয়ে থাক্‌লে মাপ কর্ব্বেন, স্যার জেম্‌স্‌, বেয়াদব হতে চাইনি, বিশেষ আপনি আমার ঘরে এসেছেন। একে গুরুস্থানীয়, তায় অতিথি। আমার ত্রুটী মার্জ্জনা করুন।"

স্যার জেম্‌স্‌ একটু ঠাণ্ডা হইলেন; কিয়ৎক্ষণ পরে বলিলেন—"ইহার সঙ্গে তোমার বিয়ে যদি ঠিক না হয়ে থাকে, তবে এরূপ স্বাধীনতা নেওয়া তো ভদ্রলোকের রীতি নয়। তুমিই নেও কি করিয়া, সেই বা নিতে দেয় কেমন করিয়া, বুঝি না।"

"ভুল বুঝ্‌বেন না, মহাশয়; আমি বাবার কাছে একদিনও একটা মিছা কথা কইনি। আপনার কাছেও বল্‌ব না। যা দেখ্‌লেন, তা একটা আকস্মিক উন্মাদ-লক্ষণ মাত্র। আমি এর আগে কখনও তাঁর গা ছুঁই নাই। কাল আমি এ বাড়ী থেকে চলে যাব, তার কথা হচ্ছিল। তার পর কি করিয়া কি যে হইল বলিতে পারি না। জেনে শুনে, ভেবে চিন্তে, কোনও অভদ্রতা করি নাই। তবে মুখ ফুটে আমরা একে অন্যকে কোনও কথা না বল্লেও, দু'জনার প্রাণটা আপনা হতেই দু'জনার কাছে আজ খুলে গেছে। আমি মেরীকে বিয়ে কর্ব্বো স্যার জেম্‌স্‌! আমাদের সুখের অন্তরায় হবেন না।"

"সে যা হয় পরে হবে। তার ঢের সময় আছে। আমি তোমায় নূতন বাড়ীতে নিয়ে যেতে এসেছি। এক্ষণি তোমায় তল্পিতাল্পা নিয়ে যেতে হবে।"

"এই রাত্রে? কাল দুপুরের পরে গেলে হয় না? বাড়ী তো আমি দেখে এসেছি, নিজেই যেতে পার্ব্বো এখন।"

কিন্তু স্যার জেম্‌স্ ছাড়িলেন না। সেই রাত্রেই নন্দনকে সঙ্গে লইয়া চলিয়া গেলেন। পথে যাইতে যাইতে বলিলেন—"তোমার জন্য যে বাড়ী ঠিক করেছিলাম সেখানে আপাততঃ যাওয়া হবে না। কিছু দিন তোমাকে আমার সঙ্গেই থাক্‌তে হবে। এখন তিন মাস তো কলেজ বন্ধ। তার পর নূতন ব্যবস্থা করা যাবে। আমি 'সাউথ সিতে' সমুদ্রের ধারে বাড়ী করেছি। সেখানেই যাওয়া যাক্।" স্যার জেম্‌সের সঙ্গে নন্দন সেই রাত্রেই চলিয়া গেল।

৩

"হাগো, নন্দন! তুমি কোথায় এমন করে ডুব মেরেছিলে বল দিকি? আমরা ভাবছিলাম তুমি হয় মরেছ, নয় দেশে ফিরে গেছ!"

"কেন বল দেখি? ছুটিতে তো সবাই বাহিরে যায়। আমি সাউথ সিতে ছিলাম।"

"কিন্তু সবাই কি চিঠি-পত্র বন্ধ করে?"

"কেন? আমি তো কত চিঠি কত লোককে দিয়েছি। দু'এক জন ছাড়া কেউ তার খবরও নেয় নাই। আমি ভাবছিলাম তারাও বুঝি লণ্ডন ছেড়ে চলে গেছে। কেন, তুমি কোথায় ছিলে? তোমাকেও তো ক'খানা চিঠি লিখেছি। এক খানারও উত্তর পাই নাই।"

"ছেড়ে দাও তোমার ও সব কাব্যসৃষ্টি। আমি লণ্ডন ছেড়ে এক পা যাই নি। আমি তোমার চিঠি পেলে তার জবাব দেই নি, এও কি কথা?"

"সত্যি বল্‌ছি, তোমায় অনেক চিঠি লিখেছি।"

"আমিও তোমায় বড় জরুরি দু'খানা চিঠি দেই। একখানারও জবাব পাই নাই।

"বল কি? জরুরি ব্যাপারটা কি ছিল বলই না।"

"আর কিছু নয়, 'ভারতকুঞ্জের' লোকেরা তোমার খোঁজ নিবার জন্য আমায় বড় ধরেছিল। আমি শুনেছিলাম তুমি স্যার জেম্‌সের ওখানে আছ, তাই তোমায় দু'বার লিখি।"

"যাক্, লণ্ডনের খবর কি বল দেখি?"

"দুনিয়ার তো চিরন্তন খবর কেবল তিন—জন্ম, বিবাহ, মৃত্যু। লণ্ডনেরও খবর তাই।"

"তোমার ফিলজফি রাখ। সোজা সত্যি কথাটা বল না।"

"যা বল্‌ছি সবই সত্যি। এক জন্ম, এক বিবাহ, এক মৃত্যু। সবই সত্যি। এক বাড়ীতে। তবে বিয়েটা জন্মের একটু আগে, পরে নয়। আর মৃত্যু সকলের শেষে।"

"এক বাড়ীতে? কোথায়?"

"ভারতকুঞ্জে।"

"জন্মটা কার?"

"কিষণের ছেলের।"

"দূর হও। তামাসা রাখ না। কিষণের বিয়ে হলো কবে যে এর মধ্যেই ছেলে হবে?"

"বিয়ে হলো আগষ্টে। ছেলে হলো সেপ্টেম্বরে।"

"কিষণ সত্যি না কি বে' করেছে; কাকে কল্লে?"

"লিজিকে—সাধুভাষায় যাঁকে এলিজেবেথ বলা হয়, বুনেদি নামটা বটে, ঘরটা যাই হোক্ না কেন! লিজিকে তুমি চিন্‌তে না? 'ভারতকুঞ্জের' চাকরাণী ছুঁড়িটাকে এর মধ্যেই ভুলে গেছ?"

"মলো কে?"

"তাও জান না? বে'টাই যেন গোপনে সেরেছিল। মরাটা তো আর বেমালুম হজম করা যায় না। সে খবরটাও পাওনি, আশ্চর্য্যের কথা! ঐ সাড়ে পাঁচটা বেজে গেছে। আর দাঁড়াতে পাচ্ছি না ভাই। ঐ আমার বাস্ এলো, আমি পালাই। 'বাই,' 'বাই,' নন্দন।"

"অত কথা বল্লে, মলো কে বল্লে না! ছাই নামটা বলেই যাও না?"

"মেরী! মরেছে মেরী। তারও না কি শুনেছি একটা ভারি রোমান্স্ আছে।"

এই বলিয়া সে ব্যক্তি উর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িয়া গিয়া বা'সে চড়িয়া, নন্দনের দিকে লক্ষ্য করিয়া হাত নাড়িতে নাড়িতে চলিয়া গেল।

নন্দন তড়িতাহতের ন্যায় নিশ্চল নিস্পন্দ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

বছর ঘুরিয়া আসিয়াছে। কিন্তু নন্দনলালের নষ্ট স্বাস্থ্য এখনও পূরা মাত্রায় ফিরিয়া আইসে নাই। তিন মাস এক নর্শিং হোমে কাটাইয়াছে। তার পর ব্রাইটনে, হ্যারোগেটে ও অপরাপর স্বাস্থ্যকর স্থানে প্রায় ছয়মাস কাল ঘুরিয়া ফিরিয়া, শেষ তিন মাস স্যার জেম্সের বাড়ীতে বাস করিয়া, আবার লণ্ডনে বাসা বাড়ীর আশ্রয় লইয়াছে। তার নাম করিতে করিতে মেরী মরিয়াছিল। বিকারে "নন্দন, আমার নন্দন, পেয়ারে আমার, সর্ব্বস্ব আমার" বলিয়া চীৎকার করিত। মাঝে মাঝে একটু চৈতন্যের উদয় হইলে, "একবার আমার

নন্দনকে ডেকে আন। একবার তাকে দেখে নি” বলিয়া কত কাকুতি মিনতি করিয়াছিল। প্রতিদিন লিজি এ সকল কথা নন্দনকে লিখিয়া জানাইয়াছিল। কিন্তু স্যার জেম্‌স্‌ সে সব গাপ করিয়াছিলেন। ক্রমে সকল ইতিহাসই নন্দনের নিকটে প্রকাশিত হইল। কিন্তু নন্দনের প্রাণ তখন অসাড় হইয়া গিয়াছে। ভাল মন্দ কোনও কথাই সে বলিল না। স্যার জেম্‌স্‌ মাপ চাহিলেন। তাতেও হাঁ, না, কিছুই বলিল না। জীবনের সে এক পৃষ্ঠা যেন তার ছিঁড়িয়া, উড়িয়া, উধাও হইয়া গিয়াছে। এমনি মনে হইল। আশা নাই, তেজ নাই, উৎসাহ নাই, উদ্যম নাই, দেবত্ব নাই, মনুষ্যত্ব নাই, পশুত্ব পর্য্যন্তও নাই—এমনি নির্জীব জড়ভরতের ন্যায় নন্দন আবার আসিয়া লণ্ডনের বাসা-বাড়ীতে আশ্রয় লইল।

স্যার জেম্‌স্‌ ভয় পাইলেন। নন্দনের বাবাকে লিখিলেন, ছেলের স্বাস্থ্য একেবারে ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, তাহাকে দেশে লইয়া যাও। নন্দনের বাবা তাহাকে অন্ততঃ কিছু কালের জন্য বাড়ী ফিরিয়া যাইতে লিখিলেন। নন্দন রাজি হইল না।

এই বাড়ীটা স্যার জেম্‌স্‌ই ঠিক করিয়া দিয়াছিলেন। বাড়ীওয়ালীকে বলিয়া গেলেন—“এ ছোঁড়ার যাতে জীবনে কোনও একটা আমোদ ও আগ্রহ হয়, তার চেষ্টা করো। এর জন্য যা উপরি খরচ পত্র হয় আমি দেব।”

"স্যার জেম্‌স্, 'রিচার্ড ফেবারেল' অবশ্যি পড়েছেন। ঐ তার ব্যবস্থা।"

"তা সে তুমি জান। ছেলেটা আমার অতিশয় বন্ধুলোকের পুত্র। আমার নিজের ছেলের মতন ভালবাসি। তাকে আমার মানুসের মত করে যদি দিতে পার, আমি চিরদিনের জন্য তোমার নিকটে কেনা থাকিব। তোমার হাতে তাকে দিলাম।"

স্যার জেম্‌স্ চলিয়া গেলেন। যাবার বেলা বলে গেলেন—"আর যাই কর না কেন, সাদায় কালোয় বে' হয় এটী আমি চাই না। এইটা বাঁচিয়ে চলো।"

৫

নন্দনের বাড়ীওয়ালী তার পরিচর্য্যার জন্য একটী অসাধারণ রূপলাবণ্যবতী চাকরাণী নিযুক্ত করিয়া দিলেন। সে নন্দনের খাবার দাবার তার ঘরে লইয়া যায়। সেখানে তার কাছে দাঁড়াইয়া তাকে সার্ভ করে। একদিন নন্দনের খাবারের সঙ্গে এক বোতল শ্যাম্পেন লইয়া গেল। অসুখের পরে, ডাক্তারের ব্যবস্থামত নন্দন কিছুদিন পোর্ট খাইয়াছিল বটে; কিন্তু জন্মে কখনও শ্যাম্পেন খায় নাই। আজ চাকরাণী এক গ্লাস ঢালিয়া তাহাকে খাইতে দিল। নন্দন যন্ত্রচালিতের ন্যায় তাহা পান করিল। এইরূপ প্রতিদিন চলিতে লাগিল। ক্রমে নন্দনের মুখে

হাসি ফুটিতে আরম্ভ করিল। মাঝে মাঝে চাকরাণীর সঙ্গে একটু ফষ্টিনাষ্টিও সুরু হইল। একদিন খাইতে খাইতে নন্দন লুসিকে বলিল—"তুমি অতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাক্‌বে কেন? আমি খাচ্ছি, তুমি ততক্ষণ বস। যে খাটুনি তোমার, কখনও ত একটু বসিতে পাও না।" সে দিন হইতে লুসি প্রায়ই নন্দনের ঘরে নানা ছুতানাতা করিয়া আসিয়া তার কাছে বসিয়া গল্পগাছা করিতে আরম্ভ করিল। আর একদিন নন্দন ডিনার খাইতে খাইতে বোতল হইতে এক গ্লাস পোর্ট ঢালিয়া লুসিকে দিল। লুসি সে গ্লাস নিঃশেষ করিয়া এক গ্লাস ঢালিয়া নন্দনকে আদর করিয়া দিল। নন্দন আবার লুসিকে দিল। লুসিও আবার নন্দনকে দিল। এইরূপে দু'জনে মিলিয়া বোতলটি খালি করিয়া ফেলিল। লুসির মুখ রাঙা হইয়া উঠিয়াছে। চোক ঢল ঢল করিতেছে। নন্দন তাহার গলা ধরিয়া চুম খাইল। লুসি নীরবে—রোগী করত যৈছে ঔষধ পান—সে আদর গ্রহণ করিল। সেই হইতে এই চুম্বনটি নন্দনের নিত্যপ্রাপ্য হইয়া উঠিল। একদিন নন্দন লুসির নিকটে একটা চুম্বন ভিক্ষা করিল। লুসি অনেক সাধ্যিসাধনার পরে সে প্রার্থনা পূর্ণ করিল। ক্রমে এমন দাঁড়াইল যে, লুসিকে ছাড়িয়া নন্দন ঘরের বাহির হয় না। সপ্তাহে বৃহস্পতিবারে সন্ধ্যায় লুসি ছুটী পাইত। নন্দনও তখন বাহিরে বেড়াইতে যাইত। ক্রমে নন্দন লুসিকে থিয়েটারে,

মিউজিক হলে, একৃজিবিষণে লইয়া যাইতে আরম্ভ করিল। এইরূপে রিচার্ড ফেভারেলের শিক্ষা পূর্ণতা পাইতে লাগিল। লুসি নন্দনের নিকট হইতে আজ হাফ ক্রাউন, কাল হাফ সভারেইন্, ক্রমে মাঝে মাঝে জিনিসটা পত্তরটা আদায় করিতে লাগিল।

৬

নন্দন ক্রমে ক্রমে আবার পড়াশুনায় মন দিয়াছে। বাড়ী-ওয়ালীর সঙ্গে একদিন একটু বচসা হওয়াতে সে বাড়ী ছাড়িয়া, সে পাড়া ছাড়িয়া, একেবারে আরলস কোর্টে গিয়া বাসা করিয়া আছে। আট নয় মাস লুসির সঙ্গেও আর দেখা সাক্ষাৎ নাই। তবে মাঝে মাঝে চিঠিপত্র ব্যবহার চলিত বটে।

৭

"একটী ভদ্রযুবতী আপনার সঙ্গে দেখা কর্ত্তে এসেছেন।" চাকরাণী আসিয়া নন্দনকে খবর দিল। নন্দন একেলা বসিয়া পড়াশুনা করিতেছিল। এ সময় কোথেকে এক স্ত্রীলোক আসিয়া হাজির হইল, ঠাওর করিয়া উঠিতে পারিল না। নন্দন জিজ্ঞাসা করিল ;—"তার কার্ড এনেছ? নাম কি?"

"সে কার্ড দিলে না। বল্লে যে আপনি তাকে চিনেন না, বিশেষ দরকারে এসেছে।"

"আচ্ছা। নিয়ে এস।" বলিয়া নন্দন আবার পড়িতে আরম্ভ করিল।

চাকরাণী অভ্যাগতাকে সঙ্গে লইয়া আসিল। নন্দন দেখিল লুসি।

"হ্যালো লুসি! তুমি কোত্থেকে উড়ে এলে। কত যুগ যে তোমায় দেখি নি।"

"দেখ্‌বে কি করে? চখের বাহির, মনের বাহির। তোমাদের ত ধর্ম্মই তাই।"

"একটু চা খাবে?"

"তোমার বাড়ীওয়ালী ভাব্‌বে কি? আমায় ঢুকতেই দিচ্ছিল না।"

"ভাব্‌বে আবার কি? এখানে তুমি আমার বন্ধু ব'লেই তো এসেছ?"

চা খাওয়া শেষ হইল। চাকরাণী চা'র বাসনকোসন সরাতে আসিলে, লুসিও উঠিয়া দাঁড়াইল। নন্দনকে বলিল;—"তবে আজ আমি আসি, ডিয়ার।" আর চাকরাণী দরজার বাহিরে যাওয়া মাত্র নন্দনকে সশব্দে চুম্বন দিয়া লুসিও বিদায় হইল।

সে দিন হইতে প্রথমে চাকরাণী তার পর বাড়ীওয়ালী সকলেই লুসিকে মিঃ লালের ইয়ং লেডি বলিয়া চিনিয়া রাখিল।

লুসিও প্রায়ই যাতায়াত করিতে আরম্ভ করিল। মাঝে মাঝে

সে নন্দনের বাড়ীতেই তার ঘরে তার সঙ্গে ডিনারও খাইতে লাগিল। কখনও বা নন্দন তাহাকে সঙ্গে করিয়া থিয়েটারেও যাইতে আরম্ভ করিল। এই ভাবে আবার পুরাণ ইয়ারকিটা একটু জমাট বাঁধিয়া উঠিতে লাগিল।

তার পর পাঁচ সাত মাস লুসি আবার অদৃশ্য হইয়া পড়িল।

৮

হঠাৎ একদিন এক অপোগণ্ড শিশু কোলে লইয়া লুসি নন্দনের নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইল। ঘরে ঢুকিয়া চাকরাণীর চখের উপরেই লুসি নন্দনকে চুম্বন করিয়া, নিজের কোলের ছেলেটী তার কোলে তুলিয়া দিল। নন্দন কায়ক্লেশে ছেলেটীকে কোলে ধরিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"এ আবার পেলে কোথায়?"

"হা ভাগ্য! এখনও চিন্‌লে না?"

"চিন্‌ব কেমন করিয়া, কখন তো আগে দেখি নাই। কাদের ছেলে বলই না?"

লুসি চোকে হাত দিয়া ফুপাইয়া কাঁদিতে লাগিল।

নন্দন তার কাছে গিয়া, গায়ে হাত বুলাইয়া আদর করিয়া তার দুঃখের কারণ জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল। যত জিজ্ঞাসা করে, ততই লুসি আরো ফুঁপাইয়া কাঁদে। নন্দন তখন ছেলেটীকে আপনার বিছানায় শোওয়াইয়া রাখিয়া, লুসির কাছে আসিয়া

বসিল। তার গায়ে হাত বুলাইতে বুলাইতে ক্রমে তার মুখখানি তুলিয়া চুম্বন করিল ও আপনার রুমাল দিয়া তার চখের জল মুছাইয়া দিতে লাগিল।

লুসি শেষটা সজোরে তাহাকে ঠেলিয়া দিয়া,—ছেলেটাকে বুকে করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে চলিয়া গেল।

৯

এই ঘটনার পাঁচ সাত দিন পরে এক রুদ্রমূর্ত্তি ইংরেজ নন্দনের সঙ্গে দেখা করিতে আসিল। ঘরে ঢুকিয়াই বলিল :—"আমি লুসির ভাই। শুনিলাম তুমি :তার সর্ব্বনাশ করেছ। এর প্রতিশোধ আমি না দিয়ে ছাড়বো না।"

"আমি লুসির উপকারই সর্ব্বদা করেছি, অনিষ্ট তো কখনও করি নাই! এমন কথা তুমি কেন বল্‌ছ, বল দেখি?"

"তোমার নিজের মনকে তুমি জিজ্ঞাসা কর। আর তোমার যদি কোনও কালে ঈশ্বর থাকে তাকে জিজ্ঞাসা কর। সেদিন তার ছেলেটাকে দেখেও তোমার একটু মমতা বা অনুতাপ কিছুই হলো না। তুমি মানুষ না পশু? লুসির সঙ্গে তোমার সম্বন্ধ কি ছিল, এ বাড়ীর সকলেই তা জানে। আর ছেলের বাপ যে তুমি ইহাও আর কারো জান্‌তে বাকি নাই।"

নন্দনের মাথায় আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল। লোক-চক্ষে

নিজের নির্দ্দোষিতা প্রমাণ করা কত যে কঠিন, একরূপ অসম্ভব বলিলেও চলে, ইহা ক্রমশঃই তার উপলব্ধি হইতে লাগিল। কি উপায়ে এ বিপদ হইতে রক্ষা পাওয়া যায়, নন্দন এই অপরিচিত ব্যক্তির সম্মুখে বসিয়া তাহাই চিন্তা করিতে লাগিল।

নন্দনের ভীতি-কাতর-ভাব দেখিয়া, তার সাহস আরো বাড়িয়া গেল। "এখন তুমি কর্‌বে কি বল? লুসি ও তার ছেলের ভরণপোষণের ভার তোমায় নিতে হবে, নইলে ছাড়্‌ছি না। একশ' পাউণ্ডের একখানা চেক্ আপাততঃ আজই চাই।" নন্দনের মুখে রা নাই। এমন বিপদে সে জন্মে পড়ে নাই, কেউ যে কখনও পড়্‌তে পারে, এও তার কল্পনায় আগে আসে নাই। নন্দন নিতান্ত নিরপরাধী তা সে জান্‌তো, আর তার দেবতাও জান্‌তেন। কিন্তু তা বল্লেই তো লোকে বিশ্বাস কর্‌বে না—আদালত সে কথা শুন্‌বে কেন?

"কথা কচ্ছ না যে? তুমি এটা তোমার নিজের দেশ পাওনি বাবা, তা বোঝ তো। আইন আদালত তো দূরের কথা; তার আগেই তোমার দফা আমি নিকাশ করিব।"

"ছ্যাখ, তুমি বিশ্বাস কর আর না কর, ঈশ্বর জানেন আর লুসিও জানে, আমি তাকে একটু আদর যত্ন, তার সঙ্গে একটু নির্দ্দোষ ফষ্টিনষ্টি করা ভিন্ন আর কোনও অপরাধ কখনও করি নাই। তবে যদি নিতান্তই টাকার দরকার হয়ে থাকে কিছু

টাকা দিতে নারাজ নই। কিন্তু তার এ বিপদের জন্য আমি দায়ী নই।”

“কিছু টাকা নয়। একশটী পাউণ্ড ছাড়তে হবে। দয়া করে দিচ্ছ না কি? আদালতে গেলে জেলে যাবে জান? লুসি চাকরির খাতিরে কুমারী সেজেছে। দেশে তার স্বামী আছে, সে কথাও তোমায় বলে রাখ্‌ছি। সে যদি এ টের পায় তবে লুসির তো সর্ব্বনাশ হবেই, তোমারও বাঁচাও নাই।”

“একশ পাউণ্ড তো আমার নাই।”

“জোগাড় কর। ধার কর, চুরি কর, ডাকাতি কর, যা খুসী কর, কিন্তু আমার এ টাকা চাই।”

আমার. মোট ত্রিশটী পাউণ্ড আছে তাই দিতে পারি, আর পার্ব্বো না।”

“আচ্ছা এখন তাই দাও। তার পরে বাকিটা না হয় দিও। লুসিকে এখনি ফ্রান্সে পাঠাতে হবে। নইলে আমরা মুখ দেখাতে পার্ব্বো না।”

নন্দন ধীরে ধীরে তার চেক বহি বাহির করিল। অভ্যাগত বলিল—“দুখানা চেক দাও। একখানা নিজের নামে লিখে বেয়ারাকে দিতে বল, আর একখানা লুসির নামে দাও।”

নন্দন অগত্যা তাহাই করিলেন। অভ্যাগত চেক্ দু’খানা পকেটে পূরিয়া চলিয়া গেল।

এইরূপে মাসে মাসে, দশ পনের কুড়ি পাউণ্ড করিয়া খসিতে আরম্ভ করিল। নন্দন নানা ছলে, কত কৌশলে বাবার নিকট হ'তে রাশ রাশ টাকা আনায়, কিন্তু লুসির দেনা আর শোধ যায় না। প্রতি মাসেই তার ভাই আসিয়া ধমক ধামক দিয়া তার তহবিল শূন্য করিয়া চলিয়া যায়। শেষে নন্দন ব্যারিষ্টারী পড়িবার জন্য যে টাকা জমা দিয়াছিল, তাহাও তুলিয়া আনিয়া লুসির জন্য বিসর্জ্জন করিল। এইরূপে মাস ছয়েক কাটিয়া গেল। তখন এ জ্বালা অসহ্য হইতেছে দেখিয়া, দেশে ফিরিয়া যাওয়াই সে শ্রেয়ঃ মনে করিল

১০

নন্দন দেশে ফিরিবার সংকল্প করিয়া, প্যাশেজ্ ট্যাশেজ্ সব ঠিক করিয়া, সাউথ সিতে স্যার জেম্‌সের সঙ্গে দেখা করিয়া বিদায় লইতে গেল। স্যার জেম্‌স্ সে দিন কর্ম্মোপলক্ষে লণ্ডনে গিয়াছেন, নন্দনকে সে দিন কাজেই তাঁর বাড়ীতে থাকিতে হইল। সন্ধ্যার সময় সমুদ্রতীরে আনমনে বেড়াইতে বেড়াইতে হঠাৎ লুসির সঙ্গে তার চোখোচোখি হইল। লুসির মাথায় চাকরাণীর টুপি, গায়ে চাকরাণীর "এপ্রণ", একখানা পেরেম-বুলাটারে একটী হৃষ্টপুষ্ট শিশু শুইয়া আছে। লুসি তাহাকে হাওয়া খাওয়াইয়া বেড়াইতেছে। উভয়ে উভয়কে দেখিতে পাইল। নন্দন পাশ কাটিয়া চলিয়া যাইতেছিল, লুসি তাহাকে ডাকিয়া অভিবাদন করিল

"গুড মর্ণিং মিষ্টার লাল, পুরাণো পরিচিতদের কি অম্‌নি করে 'কাট' করা ভাল ?"

নন্দন লজ্জিত হইল ; বলিল—"মাপ কর লুসি, আমি আন্‌মনে বেড়াচ্ছিলাম, 'কাট' কত্তে চাইনি। যাক্‌, ভাল আছ তো ? কতকাল তোমার সঙ্গে দেখা হয় নাই।"

"ভাল আছি, মিষ্টার লাল ! এখন তো লণ্ডনে থাকি না যে মাসে মাসে গিয়া দেখা কর্‌ব। এখন এখানেই চাকরি করি। ভাল কথা, মিষ্টার লাল, তুমি যে আমায় পনেরটা পাউণ্ড পাঠাইয়াছিলে, তার জন্য তোমায় অসংখ্য ধন্যবাদ দেই। কি বিপদের সময়ই যে তুমি আমায় রক্ষা করেছিলে, বল্‌তে পারি না। তুমি আমার চিঠি পেয়েছিলে, অবশ্যি।" "চিঠি ? কি চিঠি ? তোমার কোনও চিঠি তো কখনও পাই নাই ! তবে তোমার ভাই আমার সঙ্গে হামেসাই দেখা করে।"

লুসি আকাশ থেকে পড়িল—"আমার ভাই ? আমার ভাই আবার কে ? আমার তো ভাই টাই কেউ নাই ?"

"বাঃ, তামাসা কর কেন, লুসি ? সে যে তোমার নাম করে আমার কাছ থেকে প্রতি মাসেই দশ পনের পাউণ্ড লইয়া আসিতেছে।"

"মিষ্টার লাল, আমি সত্যি বল্‌ছি, এর কোনও কথাই আমি জানি না। আমার মা মর্ত্তে বসেছিল, তুমি তখন পনরটা পাউণ্ড

পাঠিয়ে তাকে বাঁচিয়েছ। তোমার এ ঋণ আমি জন্মে শোধ দিতে পার্‌ব না। আর আমি কি থামকা থামকা তোমাকে এমনি করে শোষণ কর্ব্বো? আর আমার তো এখন কোনও অভাব নাই। আমি এই ছেলেটির সেবা করি। আমার মনিব বড় ভাল লোক, ছেলেটাকে আমি বড় ভালবাসি দেখে, আমায় বছরে খাওয়া পরা ছাড়া পঞ্চাশ পাউণ্ড করে দিচ্ছেন। তুমি তো জানই মিঃ লাল, আমার মত অন্য চাকরাণীরা পঁচিশ ত্রিশ পাউণ্ডের বেশী কখনও পায় না। কিন্তু তুমি আমায় টাকা দিচ্ছ, সে কি কথা?"

"তোমার নিজের ছেলে কোথায় লুসি? তার খরচ তো তোমার জোগাতে হয়।"

"আমার নিজের ছেলে? তুমি বল্‌ছ কি নন্দন! আমার যে বে'ই হয় নি, তা ছেলে পাব কোথায়?"

"একদিন তো তুমি তাকে নিয়ে আমার কাছে গিয়েছিলে।"

"ওঃ তাই বুঝি তুমি মনে করে রেখেছ? সে যে এই ছেলে, আমার মনিবের ছেলে। তখন তারা লণ্ডনে তোমাদের বাড়ীর কাছেই থাক্‌তো। আমি কেমন অ্যাক্‌ট কত্তে পারি, তাই তোমায় দেখাতে গেছিলুম।"

"এই ছেলের জন্যই তো তোমার ভাই আমার কাছ থেকে মাস মাস দশ পনর পাউণ্ড করে নিচ্ছে?"

"কে তোমায় ঠকিয়েছে, মিঃ লাল, কে তোমায় ঠকিয়েছে!

—হাঁ ; আমি ব্যাপারখানা এখন বুঝতে পার্‌ছি। যেদিন আমি তোমার কাছে গিয়াছিলাম, সে দিন একটী লোক আমার সঙ্গে ছিল, তখন সে আমার সঙ্গে ঘুরতো ফিরতো। তাকে আমি তোমায় কেমন ভয় দেখিয়ে এসেছি তা বলি। সে-ই পনের পাউণ্ডের চেক আমায় এনে দেয়। সে লোক ভাল নয় দেখে অল্পদিনের মধ্যেই তার সঙ্গে আমার ঝগড়া হয়। সেই তোমায় শোষণ কচ্ছে। একটা তামাসার ফল এতটা গড়াবে স্বপ্নেও ভাবি নাই মিঃ লাল। আমায় মাপ কর। না জেনে বড় অন্যায় করেছি।”

নন্দন লুসিকে ক্ষমা করিল বটে, কিন্তু তার বারিষ্টার হওয়া আর হইল না। সে দেশের ক্ষুরে দণ্ডবৎ করিয়া, ঘরের ছেলে ঘরে ফিরিয়া আসিল।

বাপকে বল্লে—সে দেশের হাওয়া তার সহিল না। দেশের লোকেও তাই বুঝে গেল, কিন্তু নন্দন মনে জানে সভ্যতাটাই তার সইল না।

মৃণালের কথা

ভগিনীর পত্র

মেজদাদা,

তোমার চিঠি পাইলাম। মৃণালের পত্রখানাও পড়িলাম। তুমি ভাবিও না। আমি তারে বেশই চিনি, তোমার চাইতে বোধ হয় বেশীই চিনি। দিন কতক যদি তারে না ঘাঁটাও, সে আপনি ফিরে আসবে।

লেখার ঢংটা দেখেও কি বুঝনি ও চিঠি তার নিজের নয়। তুমি রাগ ক'রো না, তার বিদ্যা কত, আমরা ত জানি। দেখ্ছো না কি, যে সব বইএর কথা গেঁথে গেঁথে মেজ'বউ এই চিঠিটা সাজিয়েছে। আমি ভাব্ছি সে অমন চিঠিটা তোমায় পাঠালে কেন? তা না করে', কোন ভাল মাসিক কাগজে পাঠিয়ে দিলে তার লেখার তারিফ বেরোত', কালে জানি কি একজন বড় লিখিয়ে বলে লোকে তাকে জান্ত। আমার দুঃখু হয়, আমরা দুই ভাই-বোন আর উনি ছাড়া অমন একটা বড় লেখা বাংলার সমজদার পাঠকের কেউ পড়্লে না।

আমার সন্দেহ হয়, এ চিঠিটা সত্যি সত্যি মেজ'বউর লেখা কি

না। তার যে ভাইটার কথা লিখেছে, তাকে ত তুমি বেশ জান। শুন্‌ছি সে নাকি একজন ভারি লিখিয়ে হয়ে উঠ্‌ছে। শুঁড়ওয়ালা নাগরা জুতা পায় দেয়, চুড়িদার জামা পরে, আর কবিদের মতন বাব্‌রী চুল রেখেছে। শুনেছি রবিঠাকুরের সঙ্গেও নাকি খুবই জানাশুনা আছে। তাঁর নামসহি ছবি পর্য্যন্ত বাক্সে আছে, বন্ধু বান্ধবদের দেখিয়ে বেড়ায়। সে'ই হয়ত এ চিঠিটা লিখে দিয়েছে। লেখার খুব বাহাদুরি আছে, উনি পড়ে বল্লেন যে ঠিক যেন রবি ঠাকুরেরই মতন। তুমি জান কি? মেজ'বউই আমায় লিখেছিল যে, "সঞ্জীবনীতে" স্নেহলতা ছুঁড়িটার যে চিঠি বেরিয়েছিল, সেটা নাকি এই ছোঁড়াটারই লেখা, স্নেহলতার নাম জাল করে ছাপিয়েছে। আমাদেরো পড়েই তাই মনে হয়েছিল। হিন্দুঘরের মেয়ে, যতই জ্যাঠা হোক না কেন, অমন চিঠি লিখ্‌তে পারে না।

দেখ্‌ছো না, মেজ'বউএর চিঠিও এই ছাঁচেই ঢালা। আমরাও ত তোমাদের কল্যাণে একটু আধটু বাংলা শিখেছি, কিন্তু অত বড় বড় কথা ত কৈ জুটাতে পারি না! আর অত পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে লেখা! উনি বল্লেন আগা গোড়া যেন ইংরেজির তর্জ্জমা। মৃণাল কবিতাই লিখুক আর যাই করুক, ইংরেজিও পড়েনি, বিলেত টিলেতও যায় নি। সে অমন ইংরেজি ঝাঁঝের বাংলা লিখ্‌তে শিখ্‌লে কেমন করে, উনি কিছুতেই

ঠাওর কর্ত্তে পাল্লেন না। আমি মুখ্‌খু মানুষ, কি আর ব'ল্‌ব ?

তুমি বল্‌'বে, ইংরেজি হোক, বাংলা হোক, লেখাটা ত মৃণালের; ভাষাটা যারই হোক না কেন, মনের ভাবটা ত তার নিজের! আমি বলি, তাও নয়। ভাষা, ভাব, সব ধার করা, নাটুকে জিনিষ। দেখ্‌ছ না, ও কোথায় কোন্ নাটকে, কি কোন্ গানে, মীরা বাই'এর কথা পড়েছে, আর অম্‌নি ভাব্‌ছে যে, সে মীরা বাই হয়েছে। উনি বল্লেন ভক্তমালের যখন আবার নতুন সংস্করণ হবে, তখন মেজ'বউএর কোনও কবি-ভক্ত নিশ্চয়ই, মীরা বাইএর কথার পরে, তার কথাটাও বসিয়ে দেবে। এ চিঠিতে তারই আয়োজন হচ্ছে। তামাসা কচ্ছেন না, সত্যি হতে পারে। তবে তুমি মাঝখানে পড়ে বাগড়া দেবে ওঁর ঐ যা ভয়।

উনি বল্লেন, এ চিঠিটা আর কিছু নয়, কেবল হিষ্টিরিয়া। ওঁদের ডাক্তারী কেতাবে না কি লেখে হিষ্টিরিয়াতে এ সব হয়। এমন কি, অমন যে রক্তমাংসের মানুষের পিঠটা, তাও নাকি একেবারে কাচের হয়ে যায়। উনি বলেছিলেন যে ডাক্তারী বইএতে নাকি এ ধরণের একটা মেয়ের কথা আছে; তার বিশ্বাস হয়েছিল যে, তার পিঠটা কাচের হয়ে গেছে। তামাসা করে একজন তার পিঠে একটা চাপড় মারাতে, "পীঠ গুঁড়ো হয়ে গেল" বলে চীৎকার করে সে মেয়েটা তখনি মারা যায়। হিষ্টিরি-

যাতে এতটা নাকি হয়। মেজ'বউএর এও এক রকমের হিষ্টিরিয়া। তার খেয়াল হয়েছে যে, সে কারার বন্দিনী, আমাদের বাড়ীটা একটা জঘন্য জেলখানা, তোমরা সবাই কারারক্ষক। আমাদের বাড়ীর উঠানটা ত নেহাৎ ছোট নয়,—আমার শ্বাশুড়ী তোমার বে'র সময় গিয়ে ঐ উঠান দেখে আশ্চর্য্য হয়ে গেছলেন,—পাড়াগাঁয়েও অমন দৌড়দার উঠান কম, কলকাতার ত কথাই নাই। কিন্তু এত বড় উঠানটা মেজ'বউএর চোখে কত ছোট ঠেক্‌ছে! আমাদের ঘরগুলো কেমন বড় বড়, উত্তর দক্ষিণ খোলা, সাহেবদের ঘরের মতন অমন সাজান না হলেও কেমন পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, মেজেগুলো আয়নার মতন চক্ চক্ ক'চ্ছে। আর বড় বৌএর যে শুচি বাই, রাতদিনই ত কেবল জল ঢাল্‌ছেন, আর দুটো ঝির পেছুনে পেছুনে ঘুরে ঘষাচ্ছেন ও মাজাচ্ছেন, এমন সাফশুক্ষু ঘরদোর সকলের বাড়ীতে দেখা যায় না। কিন্তু অমন ঘরেও মেজ'বউএর মন উঠে না। কিন্তু মেজ'বউএর কোনও দোষ নাই। মেজ'বউ ত আর চোখ দিয়ে কোনও জিনিষ দেখে না। তার খেয়ালে যখন যেটা যেমন ঠেকে সেটাকে তেম্নি দেখে। উনি বলেছিলেন যে, সব কবি আর ঋষিদেরও নাকি ঐ রকম স্বভাব।

একদিনের কথা তোমায় বলি; এ কথাটা নিয়ে আমরা কত দিন হেসে হেসে গড়াগড়ি দিয়েছি। সে বারে আমি পূজার সময়

তোমাদের ওখানে ছিলাম। তুমি ছুটিতে কোথায় বেড়াতে গিয়েছিলে। তখন বছর পাঁচ ছয় বোধ হয় মেজ'বউএর বে' হয়েছে। আমি মেজ'বউএর ঘরেই শুতাম। একদিন, ঘোর আঁধার রাত, আকাশে ঘন মেঘ, বাহিরে গিয়ে হাত বাড়ালে হাত দেখা যায় না। অনেক রাত অবধি আমি বড়বউএর কাছে বসে গল্পগাছা কচ্ছিলাম। শু'তে গিয়ে দেখি, মেজ'বউ জানালার পাশে বসে ঐ অন্ধকার পানে তাকিয়ে আছে। বল্লাম "রাত অনেক হয়েছে, মেজ'বউ শু'তে এসো।" মেজ'বউ আমায় বল্লে কি জান ?—"ঠাকুরঝি, দেখ এসে কেমন সুন্দর চাঁদ উঠেছে। ঐ আমবাগানে যেন রূপো গালিয়ে ঢেলে দিয়েছে, আকাশে যেন রূপালী রং মাখিয়ে তার নীলবরণকে একেবারে ঢেকে ফেলেছে। মরি, মরি কি সুন্দর !"

আমি চম্‌কে উঠ্‌লাম, বল্লাম "বলিস্ কি মেজ'বউ ? এ যে ঘোর আঁধার রাত। কাল বাদে পরশু কালীপূজা। চাঁদ পেলি কোথায় ? তোর অত রসের ঢেউ আজ উঠ্‌ল কিসে ?"

মেজ'বউ একেবারে চটে উঠে বল্লে, "ঠাকুরঝি, তোমার আক্কেল কেমন ? অমন ত্রিদিববন্দ্য চন্দ্রমাকে নিয়ে ঠাট্টা তামাসা কচ্ছো ? না তোমার চোখের মাথা খেয়েছ ?"

আলোটা একটু উস্কিয়ে দিয়ে কাছে গিয়ে দেখ্‌লাম মেজ'বউএর চোখের ভাবটা সহজ মানুষের মতন নয়। প্রাণ শুকিয়ে গেল।

তবে কি শেষে পাগল হ'লো! হঠাৎ তার বিছানার দিকে চেয়ে দেখি, মেজ'বউ এক নতুন কবিতা লিখেছে—

চাঁদনি রজনী, আও-লো সজনি,
চাহলো নয়ান মেলি।
আম্র কানন, মর্ম্ম মন্থন
নর্ম্ম পরাণ কেলি।
শুভ্র উজল, অভ্র কাজল
উছল ভুবন ভরি।
মঞ্জীর মুকুরে, শিঞ্জিত নূপুরে
রঞ্জল কিবা মরি!

তখন আমার ঐ ডাক্তারী বইএর কথা মনে পড়্লো। ভাব্লাম এ খেয়ালটা তার যেমন আছে থা'ক। জোর করে ভাঙাতে গেলে হয় ত উল্টা উৎপত্তি হবে। তাই ভেবে বল্লাম—

তাই ত মেজ'বউ, আমার কি ভ্রমই হয়েছিল? সত্যাই ত বড় সুন্দর চাঁদনি রাত। তবে জানই ত, উনি কালীপূজার সময় আমায় নিয়ে যেতে আস্‌বেন, তাই ভেবে ভেবে কালই বুঝি অমাবস্যা তাই মনে হচ্ছিল। আমি বিরহে অন্ধ হয়ে গেছিলুম, তাই অমন জোছনা রাতও চোখে আঁধার ঠেক্‌ছিল।"

মেজ'বউএর মুখখানি অমনি প্রফুল্ল হয়ে উঠলো। জানালা থেকে লাফিয়ে উঠে এসে, আমায় একেবারে জড়িয়ে ধরে বল্লে,—

ঠাকুর-ঝি, তুমি তবে প্রেম তা' কি জান? আমি ভাব্‌তাম তুমি কেবল রান্নাবান্নাই কর, আর স্বামিপুত্রকে খাইয়ে দাইয়ে এ দাসীত্বেই অমন নারীজন্মটা খোয়াচ্ছো। বাঙ্গালীর মেয়ে খাঁচার পাখী, তারা কি বনের পাখীর সুর কখনও ভাঁজতে পারে? বাঁধাবুলিই ত কপ্‌চায়, দেখি! বনের গান একেবারে ভুলে গেছে। হায়! বনের পাখী হলাম না কেন?"

আমি কি আর বল্‌ব? তামাসা করে বল্লাম—

"তোর চকা তো এখন আকাশে উড়ছে; বাসায় ফিরে এলে বলিস্‌, তোরে উড়িয়ে নিয়ে বনে যাবে।"

এই চিঠি পড়ে আমার সেই কথা মনে পড়্‌ল। এও তার খেয়াল। কবিতাগুলো কি সে সঙ্গে নিয়ে গেছে, না সত্যিই পুড়িয়ে ফেলেছে? ও জিনিষ পুড়ান যায় না। দেখ দেখি, কোথাও রেখে গেছে কি না? যদি রেখে গিয়ে থাকে, তবে খুঁজে দেখ, ঐ কৃষ্ণপক্ষের জোছনার বর্ণনার মতন বিন্দি সম্বন্ধেও অবশ্য দু-দশটা কবিতা পাবে।

তুমি ত তাকে জান। পনর বছর তাকে নিয়ে ঘর করছ। সে যে তোমায় ছেড়ে বেশী দিন ঐ নীল-সমুদ্র আর আষাঢ়ের মেঘপুঞ্জ নিয়ে থাকৃতে পার্‌বে তা ভেব'না। সত্যি জিনিষে তার মন উঠে না। ছেলেবেলা থেকে সে তাই ছোট যা তাকেই বড় আর বড় যা তাকেই ছোট করে ভেবেছে। তোমার বাড়ী থেকে

তোমার শ্বশুরবাড়ী কত দূর তুমি জান। শ্যামপুকুর আর টালা ছ-দশ দিনের পথ নয়। সেকেনক্লাস গাড়ীতে আধ ঘণ্টা লাগে। কিন্তু বাপের বাড়ী ও শ্বশুরবাড়ী অত কাছাকাছি এটা ভাব্‌তে মেজ’বউএর ভাল লাগ্‌ত না। তোমারই মুখে শুনেছি, তাই সে কোনও দিন সোজা সুজি বাপের বাড়ী যাতায়াত করে নি। শিয়ালদ’এ রেলে চেপে দমদমা গিয়া নেমেছে; সেখান হ’তে ছ্যাকড়া গাড়ীতে টালায় গিয়েছে। একবার—তোমার মনে আছে কি?—সেবারে বর্ষাকালে আমি তোমাদের দেখ্‌তে যাই। মে’জ বউএর ভাইপোর ভাত। কিন্তু সে কিছুতেই গাড়ীতে বাপের বাড়ী যাবে না। শিয়ালদ’এ রেলে চেপেও যাবে না। বলে—বর্ষাকালে বধূরা নৌকায় বাপের বাড়ী যায়, সব কেতাবে লেখে। গাড়ীতে বরষায় অভিসার কোনও কালে কেউ লেখে নাই। যদি যাই ত নৌকায় যাব। এক রাত নৌকায় শোব। চড়ায় নৌকা লাগিয়ে ভাত রেঁধে খাব। মাঝিগুলো ক্যাঁৎ ক্যাঁৎ করে দাঁড় টানবে আর ভাটিয়াল গাইবে। জোট করে বস্‌ল। কি কর, তুমিও তা’তেই রাজী হলে। শোভা-বাজারে গিয়ে সন্ধ্যাবেলা নৌকায় উঠলে, বাগবাজারে এসে রাত্রে রান্নাবান্না কল্লে, পরের দিন প্রাতে শ্যামবাজারের পোলের কাছে নৌকা লাগিয়ে, পাল্‌কী করে তাকে নিয়ে শ্বশুর বাড়ী গেলে! এ সকল জেনে-শুনেও তুমি অমন অস্থির হয়েছ কেন?

আমাকে পুরী যেতে বল্‌ছ, আমি এক্ষণি যেতাম। কটক থেকে পুরী তেমন দূরেও নয়; কিন্তু গেলে উল্টা ফল হবে। আমি আমার ঠাকুরপোকে পাঠাচ্ছি, সে মেজ'বউকে চোখে চোখে রাখ্‌বে, আর প্রতিদিন আমাকে খবর দিবে। উনি তা'কে একটা খাতা করে দিয়েছেন। বল্লেন, "তুই সর্ব্বদা সঙ্গে থাক্‌বি আর এই খাতায় ডায়রী রাখ্‌বি। আর রাত্রে ডায়রীটার নকল পাঠাবি।"

মেজদাদা তুমি নিশ্চিন্ত থাক, আমরা থাক্‌তে মেজ'বউএর কোনও বিপদ ঘট্‌বে না।

দ্বিতীয় অধ্যায়

ঠাকুরপো'র পত্র

১

বউদিদি,

এই তিন দিন তোমাকে কোনও খবর দেই নাই; খবর দিবার কিছু ছিল না। তোমার মেজ'বউ যে বাড়ীতে ছিলেন, আমি এসে দেখ'লাম সেখানে নাই। সে এক পাণ্ডার বাড়ী। কোথায় যে উঠে গেছেন, তাও সে কথা বল্‌তে পার্‌লে না।

তোমার যে খুড়িমার সঙ্গে তোমার মেজ’বউ পুরী এসেছিলেন, এখন তিনি দেশে ফিরে গেছেন। তোমার মেজ’বউকে যাবার জন্য শুন্‌লাম অনেক পীড়াপীড়ি কল্লেন, কিন্তু তিনি কিছুতেই যেতে রাজি হন নি। ওদিকে তাঁর পৌত্রটীর বড় অসুখ, খবর পেয়ে বেচারী আর থাকৃতে পাল্লেন না। তোমার মেজবউ তাঁর ভাইকে নিয়ে সেই পাণ্ডার বাড়ীতেই রয়ে গেলেন, বল্লেন যখন জগন্নাথ এনেছেন, তখন রথযাত্রা না দেখে যাব না। তোমার খুড়িমা চলে গেলে, পরের দিনই তোমার মেজ’বউ সে পাণ্ডার বাড়ী থেকে কোথায় উঠে গেছেন, তারা কেউ জানে না। তবে বল্লে, স্বর্গদ্বারে নাকি একটা বাড়ী ভাড়া করেছেন।

তোমার মেজ’বউকে যদি আমি জান্‌তাম বা তাঁর ভাইএর নামটাও যদি বলে দিতে, তা হলে স্বর্গদ্বারে গিয়ে খুঁজে বের করা কিছুতেই কঠিন হ’ত না। কিন্তু আমি ত তাঁকেও দেখিনি, তাঁর ভাইএর নামও তুমি বল নাই। তোমার দাদার নাম করে খোঁজ কর্‌তে পার্‌তাম। কিন্তু তাতে পুলিশের গোয়েন্দাগিরি হ’ত, তোমরা আমাকে যে গোয়েন্দাগিরি কত্তে পাঠিয়েছ তাহা হ’ত না। কাজেই সেটা করি নাই। ঘটনা-ক্রমে কোনও সন্ধান কর্‌তে পারি কি না, তাই দেখে দেখে কেবল স্বর্গদ্বারের পথে ঘাটে এই কটা দিন ঘুরে বেড়িয়েছি।

তোমার আশীর্ব্বাদে সন্ধান পেয়েছি। আমার বাহাদুরী কিছুই নাই। কেবল ঘটনাচক্রেই ক্রটী ঘটেছে।

আজ সন্ধ্যাবেলা সমুদ্রের ধারে বেড়াতে বেড়াতে একটী পরিচিত ছেলের সঙ্গে দেখা হলো। কল্‌কাতায় যখন আমি Y. M. C. A. এর বোর্ডিংএ ছিলাম, তখন আমরা দুজনে এক ঘরে থাকৃতাম। সে আজ তিন চার বছরের কথা। হঠাৎ আজ তাকে এখানে দেখ্‌তে পেলাম। বল্লে সে তার দিদির সঙ্গে স্বর্গদ্বারে আছে। সে আমায় কিছুতেই ছাড়্‌লে না—তাদের বাড়ী নিয়ে গেল। তার ঘরে ঢুকে দেখি একটা বিলাতী ট্রাঙ্কের উপরে তোমার দাদার নাম লেখা। বুঝ্‌লাম বিধি আজ সুপ্রসন্ন হয়েছেন। যা খুঁজছিলাম, তাই আপনি মিলিয়ে দিয়েছেন। সে আমায় কিছুতেই রাত্রে না খাইয়ে ছাড়লে না। তোমার মেজ'বউএর সঙ্গেও দেখা হল, সে'ই আলাপ করিয়ে দিয়েছে। তুমি যে আমার বউদিদি এরা কেউ জানে না।

আজ এই পর্য্যন্ত। ক্রমে ক্রমে সব খবর পাবে এখন। তবে তোমরা যে প্রতিদিন একটা ডায়রী পাঠাতে বলেছ তা কি দরকার? যে দিন বিশেষ কিছু বল্‌বার থাকে সে দিনই চিঠি লিখ্‌ব। আর পুরীতে যারা হাওয়া খেতে আসে তাদের ডায়রী কিরূপ হবে, তা তুমিই জান। প্রাতে চা

পান। তারপর সমুদ্রের ধারে ভ্রমণ। তারপর গৃহে প্রত্যাগমন। নয়টার সময় মুনিয়ার আগমন। সাড়ে ৯টা হইতে ১১টা সমুদ্রে স্নান ও মুনিয়ার হাত ধরিয়া ঢেউ খাওয়া ও সাঁতার কাটবার ভাণ করা। ১১৷৷৹টায় আহার। ৩টা পর্য্যন্ত নিদ্রা। ৪টায় চা পান বা জলখাবার। ৫টা হইতে ৮টা পর্য্যন্ত আবার সমুদ্রের ধারে বেড়ান। রাত্রে আহার ও তারপর শয়ন। তোমার মেজ'বউএর ডায়রীও ঠিক এই। এটা আমি তাঁর ভাইএর কাছ থেকে ইতিমধ্যেই বে'র করে নিয়েছি। সুতরাং প্রতিদিন এইরূপেই কাটছে, জানিয়া রাখিও। প্রতি রাত্রে পুরাতন কথা লিখে বেহুদা কাগজ ও কালি খরচ করার কোনও প্রয়োজন আছে কি? যদি থাকে, লিখিও হুকুম তামিল কর্‌ব। এখন ধর্ম্মাবতারকে সেলাম করিয়া এ অধীনের তবে শয্যাশায়ী হইতে আজ্ঞা হয়।

২

বুউদিদি,

আজ একটা নূতন খবর আছে। শুনে তুমি খুসী হবে। তোমাদের খরচ বাঁচ্‌ল। আমি ভিক্টোরিয়া হোটেল ছেড়ে চলে এসেছি। শরৎ (মেজ'বউএর ভাইএর নাম শরৎ) ক'দিনই আমাকে তাদের সঙ্গে এসে থাক্‌তে পীড়াপীড়ি

কচ্ছিল। আমি কিছুতেই রাজি হই নি। ইচ্ছা যে ছিল না তা নয়, কিন্তু নিজেকে অত সস্তা করাটা কিছু নয়, তুমি দাদাকে সর্ব্বদা এই কথা বল। তাই আমিও নিজেকে সস্তা কর্‌তে চাই নি। যা হউক কাল রাত্রে, তোমার মেজ'বউও বড় ধরে বস্‌লেন। তিনি আমাকে নরেন বলেই ডাকেন, আর আমিও তাঁকে দিদি বল্‌তে আরম্ভ করেছি। তাঁর অনুরোধ আর এড়াতে পার্‌লাম না। তোমাদের কাজের অনুরোধেও এ আতিথ্যগ্রহণ করাই ভাল মনে কল্লাম। তোমার মেজ'দাদাকে লিখ, আমি তাঁর গিন্নিকে পাহারা দিচ্ছি। গোয়েন্দাগিরিটা জম্‌ছে ভাল।

আচ্ছা, বউদিদি, তোমরা তোমাদের মেজ'বউএর উপরে অমন নারাজ কেন? আমার ত তাঁকে বেশ ভালই লাগে। ভাল'র চাইতেও ভাল লাগে,—সত্যি বড় মিষ্টি লাগে। মুখে হাসি যেন লেগেই আছে। চালচলন অতি শোভন, চোখ দুটো ভাবে ঢল ঢল, নিজেকে সাজাবার কোনও চেষ্টা নাই, অথচ সাজা জিনিষটা যেন আপনি জোর করে এসে তাঁর অঙ্গে অঙ্গে বসে যায়। কথা অতি মিষ্টি। সমুদ্রের ধারে বেড়াতে গিয়ে এক এক বার কেমন উদাস পারা হয়ে এক দৃষ্টিতে চেয়ে থাকেন,—দেখে আমার সেই কীর্ত্তনের পদ মনে পড়ে—

যোগী যেন সদাই ধেয়ায়!

তোমাদের কত ভাগ্যি, অমন বউ পেয়েছ। দিন রাত কেবলই লিখ্‌ছেন আর পড়্‌ছেন। আর তাঁর পড়্‌বার ধরণটা বড় সুন্দর। সর্ব্বদাই পেন্‌সিল ও খাতা নিয়ে পড়্‌তে বসেন; আর যখন যেখানে মিষ্টি কথা পান, তাই টুকে রাখেন। আমায় বলেছিলেন এতে কবিতা লেখার নাকি খুব সুবিধা হয়। আমি জিজ্ঞাসা কল্লাম, "কি করে সুবিধা হয়, দিদি?" বল্লেন, "জান কি, বড় বড় কবিরা যেন এক এক জন ভারি রাজমিস্ত্রি। আর এই যে সুন্দর কথাগুলি এগুলি তাদের পস্তিরকাজের মালমসলা। ঐ মিষ্টি মিষ্টি কথা গুলো চুনে চুনে, "মোর," "হায়," "সখি," "সখা," "বঁধু" প্রভৃতি মিষ্টি কথার বুক্‌নী দিয়া সাজা'লেই অতি সুন্দর কবিতা হয়।"

আমিও এখন থেকে খাতা হাতে করে সব বই পড়ি। দেখ কি, তোমার মেজ'বউয়ের কল্যাণে হয় ত তোমার এই ঠাকুরপোও ক্রমে একটা কবি হয়ে উঠ্‌বে। বাঙ্গলা মাসিকে ছাপাবার মতন ভারি ভারি দু-দশটা এরি মধ্যে পকেটে জড় হয়েছে। গোয়েন্দাগিরি কর্‌তে এসে একেবারে একটা ডাকসই কবি হওয়া সকলের ভাগ্যে ঘটে না। তবে ভাগ্য জিনিষটাই নাকি অন্ধ, তার গমনে নাইক কোন ছন্দ, আমার কপাল নহে নেহাৎ মন্দ; কর কি এখনও তুমি সন্ধ; তবে তোমার সঙ্গে আমার দ্বন্দ্ব; করিলাম এখানেই চিঠি বন্ধ।

৩

বউদিদি !

তোমার শ্রীপাদপদ্মে কোটী কোটী প্রণাম করি। তুমি যদি মেম সাহেব হ'তে, তা হ'লে লক্ষ লক্ষ ধন্যবাদ তোমায় দিতাম। তোমার কল্যাণে এই গোয়েন্দাগিরি কর্‌তে এসে কি সুখেই দিন কেটে যাচ্ছে। তোমার ফরমায়েস খাট্‌তে হয় না, ছেলেদের পড়া বল্‌তে হয় না, আপিসে কলম পিস্‌তে হয় না, ঘরে গিন্নির মুখ ঝাম্‌টা খেতে হয় না ; দিনে শুতে পাই, ঝিমুতে হয় না ; রেতে ঘুমুতে পাই, ছেলে বইতে হয় না ; আর দিন রাত কবিতা শুন্‌তে পাই, দুনিয়াশুদ্ধ লোকের সঙ্গে বকাবকি কর্‌তে হয় না। আমার মনে হয়, স্বর্গে যারা যায়, তারা বুঝি এই ভাবেই দিন কাটায়। বস্তু যত সব ছায়া হয়ে গেছে, ছায়া যত সবই কেবল কায়া নয়, প্রাণী হয়ে উঠে, চারিদিকে ছুটোছুটি কচ্ছে। বিজ্ঞান পড়ে যা ভুল বুঝেছিলাম, সব এখন শুধ্‌রে যাচ্ছে। চোক কাণ গুলোকে ফাঁকি দিয়ে এখন কেবল মন দিয়ে সব জ্ঞান আহরণ কর্‌তে শিখ্‌ছি। এ শিক্ষায় তোমার মেজ'বউ আমার গুরু হয়েছেন! সত্যি বল্‌ছি বউদিদি, মানুষের মনটা যে কত বড় জিনিষ, এতদিন বুঝি নি। এই মনই ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর, সৃষ্টি স্থিতি ও প্রলয়-কর্ত্তা। তোমার মেজ'বউএর মন ঠিক তাই !

সে দিন আমরা নরেন্দ্রসরোবরের ধারে বেড়াতে গিয়াছিলাম। সেখানে একটা অতি সুন্দর মন্দির হয়েছে। তোমরা দেখ নি। মন্দিরের বাগানে বিস্তর আমগাছ আছে। একটা আমগাছে এই অকালেও নতুন লালপাতা গজিয়েছে। তোমার মেজ'বউ আমায় গাছটা দেখিয়ে বল্লে, "দেখেছ নরেন, ঐ গাবগাছে কেমন লাল লাল পাতা বেরিয়েছে।"

আমি বল্লাম—"গাবগাছ কৈ দিদি, ওটা যে আম গাছ!"

দিদি বল্লেন—"আমগাছ কখনই নয়; তুমিও এত বড় একটা মিথ্যাকে প্রতিষ্ঠিত কচ্ছো? আমাদের বাড়ীর দেয়ালের আড়ালে এরই মতন একটা গাবগাছ আছে, তার এই যৌবনের সাজ দেখে আমি বসন্তের সংবাদ পেতাম। আর তাকেই কি না তুমি বল্‌তে চাও, আমগাছ?"

আমি তো একেবারে অবাক্ হয়ে গেলাম। ধীরে ধীরে বল্লাম, "একটু কাছে গিয়ে দেখুন, ওটা যে আমগাছ তা বুঝ্‌তে পার্‌বেন।"

তোমার মেজ'বউ আরো গরম হয়ে উঠে বল্লেন—"কাছে গেলেই কি সত্য দেখা যায়? অন্ধেরা তো হাতিটাকে গিয়ে হাতড়িয়েছিল, কিন্তু তাকে সত্যই দেখ্‌তে পেয়েছিল কি? দেখে চোখ নয়—মন, আর মনের নিকটে আবার কাছে আর দূরে কি? তুমি কি দেখে ওটাকে আমগাছ ভাব্‌লে আমি

বুঝ্‌তেই পাচ্ছি না। ওটা যদি আমগাছ হবে তবে তার ডালে ডালে কোকিল কৈ? ডগায় ডগায় ভৃঙ্গ কৈ? আকাশে আকাশে কুহু কুহু কৈ? ঘরে ঘরে উহু উহু কৈ? কেবল লাল পাতা দেখে ওটাকে আমগাছ ভাব্‌ছ, লালপাতা যে গাবগাছেও হয়।"

বেগতিক দেখে বল্লাম "তুমি যখন বল্‌ছ, তখন গাবই বা হবে।"

"গাবই বা হবে কেন, গাবই নিশ্চয়ই। ওটা যদি গাব না হয় তবে কবির দৃষ্টি কি মিথ্যা হবে?"

আমি বল্লাম—"কখনই হতে পারে না। বিধাতা যে কবির চোখেই তাঁর জগৎকে দেখেন। তিনিও ত কবি।"

এতগুলি ধর্ম্মকথা বলে তবে প্রাণে বাঁচ্‌লাম। এবার থেকে তোমার মেজ'বউ যখন যা বল্‌বে, তা'তেই হুঁ দিয়ে যাব।

৪

বউদিদি,

আমার ছুটি-তো ফুরিয়ে আস্‌ছে, আর কত দিন তোমার মেজ'বউকে পাহারা দিতে হবে? তোমার মেজদাদাকেই না হয় পাঠিয়ে দাও, গতিক বড় ভাল বোধ হচ্ছে না। যে কবিতার ঢেউ উঠ্‌ছে, তাতে তোমার মেজবউকে কোথায় নিয়ে

যাবে, বলা যায় না। আর আমাকে পরের স্ত্রীর পাহারা দিতে পাঠিয়ে তোমরা ঘরেও যে খুব শান্তি পাচ্ছ, তাও ত সম্ভব নয়। তবে একবার নাকি আমি আগুনের ভিতর দিয়ে হেঁটে যাবার ফন্দিটা শিখেছিলাম, ঐ যা তোমাদের ভরসা।

সত্যি বল্‌ছি আমার ভাব্‌না হয়েছে। তোমার মেজ'-বউকে এই একমাস কাল দিনরাত দেখে দেখে, এতটাই চিনেছি বলে মনে হয় যে, বাহিরে তাঁর যতই কবিতা গজা'ক না কেন, ভিতরটা ঠিক্ আছে। সে ভাবনা আমার হয় না! তবে জান কি, ভিতর শুদ্ধ থাক্‌লেই যে বাহিরে কালির ছিটা পড়ে না বা পড়্‌তে পারে না, তা নয়। ঐ ভয়টাই আমার বড় বেশী হচ্ছে। অথচ কেমন করে যে বেচারীকে বাঁচাই, ভেবে পাচ্ছি না। তারই জন্য তোমাকে লিখ্‌ছি। নহিলে তোমাকেও লিখ্‌তাম না;—এ সব কথা কাউকেই বলা ভাল নয়। বলাবলিতেই যত গোল বাধে।

আমার আরও বেশী বিপদ হয়েছে এই জন্য যে, শরৎ হঠাৎ কল্‌কাতায় চলে গেছে। বাড়ীতে তোমার মেজ'বউ, একটা বুড়ী চাকরাণী আর আমি, আমরা তিন প্রাণী মাত্র আছি। তার জন্যও আমি ভাব্‌তাম না। কিন্তু শরৎটা নাকি নেহাৎ গাধা, যাবার সপ্তাহ খানেক আগে একটা সাহিত্যিক বন্ধুকে এনে জুটিয়ে দিয়ে গেছে। এ ব্যক্তি নিতান্ত ছোক্‌রা নয়, বয়স তোমার মেজদাদারই মতন। বল্‌ছে ত যে বিলেত টিলেত ঘুরে এসেছে,

কিন্তু ইংরেজি শুনে কথাটা বিশ্বাস কর্‌তে মন উঠে না। তবে ইংরেজ কবিদের নাম হামেষাই মুখে লেগে আছে।

ইনি তোমার মেজ'বউকে, ব্রাউনীং বলে একজন খুব বড় ইংরেজ কবি আছেন, তাঁর কবিতার তর্জ্জমা করে পড়াচ্ছেন। এখন প্রতি দিন বিকেল বেলা সমুদ্রের ধারে গিয়ে দুজনে কবিতা পড়েন, আর এ গরিব পাহারাওয়ালা দায়ে পড়ে কাজেই সেখানে গিয়ে বসে বসে ঝিমোয়। আমি মুখ্‌খু লোক,—কেরাণীগিরি করে খাই, তার উপরে কোনও দিন জাহাজে চড়ি নি। কাজেই এই সাহিত্যিকবরের চক্ষে যে অতি নগণ্য হ'ব, ইহা আর আশ্চর্য্য কি? তবে তোমার মেজ'বউএর একটা বড় বাহাদুরী দেখ্‌তে পেলাম। আমি যে তাঁর [illegible]র ভাই নই, তিনি ঘুণাক্ষরেও এ কথাটা এ ব্যক্তিকে জান্‌তে বা বুঝ্‌তে দেন নি। একদিন ও জিজ্ঞেস কচ্ছিল —"শরৎ বাবু, আর নরেন বাবু এঁদের মধ্যে বড় কে?" তোমার মেজ'বউ বল্লেন—"নরেনই বড় বটে, তবে পিঠোপিঠি বলে শরৎ ছেলেবেলা থেকেই কোনও দিন একে দাদা বলে ডাকে নি।" কথাটা শুনে অবধি তোমার মেজ'বউএর উপরে আমার ভক্তি বেড়ে গেছে। যতটা বোকা মনে হচ্ছিল, ততটা বোকা নন্। কবিতাই লিখুন আর যাই করুন, ভিতরে ভিতরে বিষয়বুদ্ধিটুকু বেশ আছে।

৫

বউদিদি,

তুমি ও লোকটার পরিচয় জান্‌তে চেয়েছ। এ সব লোকের পরিচয় পাওয়া বড় কঠিন। বাংলা সাহিত্যে আজকাল বড় বড় সাহিত্যিক যে কি করে গজিয়ে উঠে, ভগবান্‌ও তার ঠিক কর্‌তে পারেন কি না সন্দেহ। কবিতা যেমন এদের আকাশ থেকে ঝুর ঝুর করে পড়ে, এদের জন্মকর্ম্মটাও তেম্নি দিব্য ব্যাপার বলে মনে হয়। এঁকে আমরা কেবল মিষ্টার মৈত্র বলেই জানি। শরৎকে জিজ্ঞেস কর্‌ছিলাম এঁর বাড়ী কোথায়, আছে কে, করেন কি, সে ওসব কথার কোনই উত্তর দিতে পার্‌লে না! বল্লে—"ও সব খবর সংসারের লোকেই রাখে। সাহিত্যজগৎ মনোজগৎ, ভাবরাজ্য; এখানে জন্মকর্ম্মের পরিচয় কেউ নেয় না, রসসৃষ্টির শক্তির প্রমাণ পরিচয়ই যথেষ্ট। মিষ্টার মৈত্রের লেখাই তাঁর শ্রেষ্ঠ পরিচয়।" এর উপরে ত আর কোনও কথা চলে না। কাজেই ইঁহার কোনও পরিচয় এ পর্য্যন্ত পাই নাই, পাবার আশাও রাখি না।

তবে নামগোত্রের পরিচয় না পেলেও, কাব্যরসপটুতার পরিচয় প্রতিদিনই পাচ্ছি। সে পরিচয়টা তোমাকে দিতে পারি। কাল বৈকালে বৃষ্টি হচ্ছিল। কাজেই সমুদ্রের ধারে আমরা বেড়াতে যেতে পারি নাই। মিষ্টার মৈত্র এখানে বসেই তোমার মেজ'বউএর সঙ্গে সাহিত্য-চর্চ্চা কচ্ছিলেন। ইনি ব্রাউনীংএর

একটা বাংলা অনুবাদ কচ্ছেন, তোমার মেজ'বউকে তাই পড়িয়ে শুনাচ্ছিলেন। ভুলক্রমে এখানেই সে অনুবাদটা ফেলে গেছেন, তার খানিকটা তোমায় পাঠাচ্ছি।

ওগো সুন্দর মোর!
ও বয়ানে তব, এ নয়ান মম
পিয়ে পিয়ে হলো ভোর।
ওগো সুন্দর মোর!
চোরের মতন কতই চাতুরী,
গুপ্ত প্রেমের কিবা ঐ লহরী,
নাচত আঁখিতে উঠত শিহরি
সুখের নাহিক ওর!
ওগো সুন্দর মোর!
ঘরের ভিতরে বসে যারা ঐ,
ভাবিছে কাতরে গেল ওরা কৈ,
কৌতুকে কপোল করে থৈ থৈ,
বাহিয়া বাহিছে লোর।
ওগো সুন্দর মোর!
আমরা দুজনে, বিজনে বিপিনে,
নীপ মূলে এই, কিবা নিশি দিনে,

বাঁধা আছি, নতু আঁধোয়া তু বিনে,
কে ভাঙ্গে মোদের জোড় ?
ওগো সুন্দর মোর !
তিলে তিলে গড়ি কতেক ছলনা,
পলে পলে পরি শতেক গহনা,
গাহি মূলতান, পূরবী সাহানা,
কাটিছে রজনী ঘোর,
ওগো সুন্দর মোর !
এ সুখ তেয়াগি, কোন্ সুখ লাগি,
কোন্ মন্ত্র পড়ি, কি সিন্দুর দাগি'
কিইবা সোহাগে, মিলিবে কি ভাগি,
কলা, মোচা, কিবা, থোড় !
ওগো সুন্দর মোর !
আষাঢ় মাসের গুপ্ত অভিসার,
ভৈরব ঐ নিত্য বরিষার,
মর্ম্ম বিদারি এ ঘমের ধার,
চর্ম্মে ঝুরিছে ঝোর !
ওগো সুন্দর মোর !
ছাড়িয়া এ সব বিভব ছন্দে,
ঘুরিয়া ফিরিয়া ভবের ধন্দে,

কোন্ রূপে রসে, গন্ধে গন্ধে
আনিবে আনন্দে তোর?
ওগো সুন্দর মোর!
থাক্ তারা নিজ জগৎ লইয়া
রান্ধিয়া বাড়িয়া, খাইয়া, শুইয়া,
জীবনে মরিয়া, মরমে মারিয়া
কেবলি ঘাঁটিয়া হোড়!
ওগো সুন্দর মোর!
জান নাকি তুমি উহাদের রীতি,
যশমান দিয়া কষয়ে পিরিতি
ঝগড়া-ঝাটি হয় নিতি নিতি
ভাঙ্গাতে ভামিনী ভোর
ওগো সুন্দর মোর!
নাহি সুতা হাতে, হলো কিবা তায়
ও রীতি দেখিলে পিরিতি পালায়?
দীপ্ত হৃদের মুক্ত হাওয়ায়
যুক্ত পরাণ-ডোর।
ওগো সুন্দর মোর!

দাদাকে বলো, এর মূলটা ব্রাউনীংএর In a Balconyতে কোথাও নাকি আছে। মূলের সঙ্গে মিলুক আর নাই মিলুক

অনুবাদের বাহাদুরী আছে বটে। আর সব চাইতে এর বাহাদুরী এই যে তোমার মেজ'বউকে এ কবিতাটায় একেবারে ক্ষেপিয়ে তুলেছে। তিনি বারবার এসে আমায় বল্‌ছেন "দেখ নরেন, দেখ, দেখ, কি সুন্দর শুনাচ্ছে—

দীপ্ত হৃদের মুক্ত হাওয়ায়
যুক্ত পরাণ-ডোর—

লেথার কি ভঙ্গী, ভাবের কি গভীরতা। বাংলায় এক রবি ঠাকুর ছাড়া আর কেউ অমন লিখ্‌তে পারে না। তুমি ত ব্রাউনীং পড়েছ, ব্রাউনীং সত্যি কি এত মিষ্টি ?" এর উত্তর আমি কি আর দিব। আমার কেবল ইচ্ছা হলো বউদিদি, ঐ মিষ্টার মৈত্রটাকে আমার এই জিমন্যাষ্টিকপটু মুষ্টিটা যে কত মিষ্টি তাই দেখিয়ে দি। সত্যি বল্‌ছি বউদিদি, এ লোকটা যদি শিগ্‌গির সরে না পড়ে, তবে কোন্ দিন যে আমার সঙ্গে একটা ফৌজদারী বেধে যাবে জানি না।

৬

বউদিদি !

যা ভয় কচ্ছিলাম, তাই হয়েছে। আজ সন্ধ্যা বেলা জুতিয়ে ঐ লোকটার হাড় ভেঙ্গে দিয়েছি। বোধ হয় সে আর এখানে মুখ দেখাতে সাহস পাবে না। আজকের এই জুতাপেটাটা কেউ

জানে না, কেবল আমার হাত জানে, আর জুতা জানে, আর ওর পীঠ জানে, আর কেউ জানে না ; তোমার মেজ’বউও ভাল করে জানেন কিনা সন্দেহ। কিন্তু আমি তাকে বলে দিয়েছি, ফের যদি পুরীর সমুদ্রের ধারে দেখ্‌তে পাই, তবে সবার সাম্‌নে জুতাপেটা করে ছাড়্‌ব। সে পায়ে ধরে দিব্যি করে গেছে, আজ রাত্রেই পুরী থেকে চলে যাবে। আমার বিশ্বাস তাই কর্‌বে।

কেন হলো, কিসে হলো, আমার নিজের মনে মনেও তার আলোচনা কর্‌তে ইচ্ছা হয় না ; ভয় হয় বুঝিবা এ চিন্তাতেও তোমার মেজ’বউএর অকৈতব শুদ্ধ চরিত্রের মর্য্যাদা নষ্ট হয়। কিন্তু তোমাকে না বল্লে নয়। তোমার মেজ’বউএর প্রাণে যে আঘাত লেগেছে, তার ফল কি যে হবে, ভেবে পাচ্ছি না। এই আঁধার রাতে সমুদ্রে গিয়ে ঝাঁপ না দিলে বাঁচি। দিনরাত আমায় এখন তাঁকে খাড়া পাহারা দিতে হ’বে দেখ্‌ছি।

ঘটনাটা তোমায় লিখ্‌তেই হচ্ছে, কিন্তু আমার আদৌ ইচ্ছা নয় যে দাদাও এটা জানেন। আমরা পুরুষমানুষ, স্ত্রী-চরিত্র যে কিছুই বুঝি না, বউদিদি! তাই ভয় হয় দাদাও তোমার মেজ’বউ সম্বন্ধে সুবিচার কর্‌তে পার্‌বেন না। যদি পার, তবে তাঁকেও দেখিও না, তোমার মেজদাদার ত কথাই নাই। এই পত্রখানা পড়িয়াই পুড়াইয়া ফেলিবে।

ঘটনাটা এই। কাল রাত্রে আমার একটু সামান্য জ্বর

হয়েছিল; তাই আজ সন্ধ্যার সময় আর সমুদ্রের ধারে বেড়াতে যাই নি। মিষ্টার মৈত্র অনেক অনুনয় বিনয় করাতে তোমার মেজ'বউ তাঁর সঙ্গেই সমুদ্রের ধারে বেড়াতে গেলেন। আমায় বলে গেলেন যে বেশী দূরে যাবেন না, বাড়ীর সাম্‌নেই বেড়াবেন। তখন সবে রোদ পড়েছে। আমি দরজায় বসে দুজনায় বেড়াচ্ছেন দেখ্‌তে লাগ্‌লাম। ক্রমে অন্ধকার হয়ে এল। কাজেই আমি আর স্থির থাক্‌তে পার্‌লাম না। তোমার মেজ'বউএর খোঁজে বেরুলাম। সমুদ্রতীরে গিয়া দেখ্‌লাম তিনি সেখানে নাই। ভারি মুস্কিলে পড়্‌লাম। কোন্ দিকে গেলেন ঠাওর কর্‌তে পার্‌লাম না। কা'কেই বা জিজ্ঞাসা করি? এমন সময় একটী পরিচিত লোকের সঙ্গে দেখা হলো। তিনি বল্লেন—"আপনি যে আজ বড় পিছিয়ে পড়েছেন, আপনার ভগিনী চক্রতীর্থের দিকে যাচ্ছেন দেখলাম।" শুনে কি জানি কেন আমার বুকটা ধড়াশ করে উঠ্‌ল। চক্রতীর্থ ত দোরের কাছে নয়। স্বর্গদ্বার চক্রতীর্থ দেড় ক্রোশের পথ। আর সন্ধ্যাবেলা সে অতি নিরালা স্থান। আমিও ঐ দিকেই বালি ভেঙ্গে ছুট্‌লাম। গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি প'ড়তে আরম্ভ করেছে। সমুদ্রতীর জনমানবশূন্য হয়ে পড়েছে। সারকিট্‌ হাউস্‌ ছাড়িয়ে দেখ্‌লাম, আর কোথাও কেউ নাই। হঠাৎ যেন একটা অস্ফুট চীৎকার কাণে গেল। সেই শব্দ লক্ষ্য করে দৌড়ে গিয়া দেখ্‌লাম, ঐ লোকটা তোমার মেজ'বউকে

অপমান কর্‌বার চেষ্টা কচ্ছে। আমি এক লাফে তার উপরে পড়ে তোমার মেজ’বউকে ছাড়িয়ে নিয়ে, তার গলার চাদর কষে ধরে, পায়ের জুতা খুলে, গায়ে যত জোর ছিল তাই দিয়ে বেটাকে পিটুতে আরম্ভ কর্‌লাম। যখন একেবারে মাটিতে পড়ে গোঁগাতে লাগ্‌ল তখন ছাড়্‌লাম। তোমার মেজ’বউ একেবারে পাথরের মত নিশ্চল, অসাড় হয়ে এই ব্যাপার দেখ্‌ছিলেন। আমি কাছে যাবা মাত্র, মাটিতে পড়ে উপুড় হয়ে কাঁদ্‌তে লাগ্‌লেন। তোমার মেজ’বউ একটু সুস্থ হলে, তাঁকে নিয়ে বাড়ী এলাম। ক্রোধে, অপমানে, লজ্জায়, ভয়ে, অনুতাপে, তাঁর দশা যে কি হয়েছে বল্‌তে পারি না। এই আধ ঘণ্টা কালের মধ্যে তাঁর মুখ একেবারে পাংশু হয়ে গেছে, চোক বসে গেছে, মনে হয় যেন ছ মাসের রোগী। হঠাৎ মানুষের চেহারার অমন পরিবর্ত্তন হয়, ইহা জন্মে আর কখনও দেখি নাই। বাড়ী আসিয়া তোমার মেজ’বউ ঘরে যাইয়া দোরে খিল দিয়া শুয়ে পড়েছেন। আমি কি কর্‌ব, ভেবে কূলকিনারা পাচ্ছি না। যে ঝিটা আছে, তাকে কোন কথা বল্‌তেও পারি না, নিজে যাইয়াও তাঁর সেবাশুশ্রূষা কর্‌তে পাচ্ছি না। হয়ত এই চিঠি পেতে না পেতেই তুমি এখানে আস্‌বার জন্য আমার টেলিগ্রাম পাবে। কাল প্রাতঃকালের অপেক্ষায় বসিয়া রহিলাম।

৭

বউদিদি,

ভগবান্ বাঁচালেন। শরৎ আজ প্রাতে ফিরে এসেছে। তাঁ:কে কালকার ব্যাপারের কথা কিছুই বলিনি। বলা যায় কি? সে ভাব্ছে তার দিদির অসুখ করেছে। অসুখও করেছে সত্যি। খুব জ্বর হয়েছে। মাথার খুব যাতনা। বিকার না হলে বাঁচি। দেখি ঠাকুর কি করেন। দাদাকে তোমার মেজ'-বউএর অসুখের কথাটা বলে রেখো। বাড়াবাড়ি হলে আস্তেই হ'বে। তারে খবর দিব।

৮

বউদিদি,

ঠাকুরের প্রসাদে আজ সাতদিন পরে তোমার মেজ'বউএর জ্বর ছেড়েছে। চেহারাটা একেবারে ভেঙ্গে গেছে, সে রং নাই, সে কোনও কিছুই নাই। চোখের ভিতরে কি যেন একটা কাতরতা জেগে উঠেছে। আজ বিকাল বেলা আমায় ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন—"শরৎ কোথায়?" আমি বল্লাম—"কিছু আঙ্গুর আর ডালিমের জন্য বাজারে গেছে; আর কলকাতা থেকে কিছু ফল আস্বার কথা, তাও এসেছে কিনা, দেখ্তে ষ্টেসনে যাবে।" তখন আমাকে কাছে ডেকে, বিছানায় বসিয়ে,

আমার হাতখানা ধরে বল্লেন—"নরেন, তুমি আমার সত্য ভাইএর কাজ করেছ, তুমি না থাক্‌লে সেদিন আমার কি হ'তো জানি না। প্রথম দিন থেকেই আমি যে চোখে শরৎকে দেখ্‌তাম, সেই চক্ষে তোমায় দেখেছি। তাই শরৎ যখন কলকাতায় যেতে চাইলে, কোনও আপত্তি করি নাই। শরৎ আমার জন্য যা কর্‌তে পার্‌ত না, তুমি তাই করেছ, এ ঋণ জন্মে শোধ দিতে পার্‌ব না।" বলিতে বলিতে চক্ষু দুটা জলে ভরিয়া উঠিল। ক্রমে নিজেকে একটু সাম্‌লে নিয়ে বল্লেন—"শরৎ সব শুনেছে?"

আমি বল্লাম "না। কিছুই শুনে নি। ওকি বল্‌বার কথা? শরৎ কেবল জানে যে আপনার অসুখ করেছে।"

"শরৎ তো আমায় 'আপনি' বলে না, তুমি বল কেন?"

বউদিদি আমারও চক্ষে জল আসিল। একটু স্নেহের জন্য ঐ প্রাণটা যে কতই তৃষিত হয়ে আছে, দেখে আমার প্রাণটাও কেমন করে উঠ্‌ল।

বল্লাম "আচ্ছা আমি এখন থেকে তুমিই বল্‌ব। আর তুমিও শরৎকে যেমন কখন 'তুমি' কখন 'তুই' বল, আমাকেও তেমনি বল্‌বে?"

"আমার অসুখ বাড়্‌লে তোমরা কি কর্‌তে বল ত?"

"কর্‌ব আর কি, ভাল ডাক্তার ডেকে চিকিৎসা করাতাম।"

"এখানে কি ভাল ডাক্তার আছে?"

"এখানে নাই, কটকে আছে।"

"সেখান থেকে কি এখানে ডাক্তার আসে ?"

"আনালেই আসে।"

"আমার ত অত টাকা নাই ?"

"যে ডাক্তার আস্‌ত সে টাকার জন্য আস্‌ত না।"

"তবে কিসের জন্য ?"

"তুমি আমার দিদি, তারই জন্য আস্‌ত।"

"সে ডাক্তার তোর কে হয় নরেন ?"

"তিনি আমার দাদা, কটকের সিভিল সার্জ্জন।"

"তোমার দাদা কটকের সিভিল সার্জ্জন! তোমার দাদার নাম কি ?"

আমি দাদার নাম বল্লাম। তোমার মেজ'বউ অমনি চমকে উঠে বল্লে, "উনি তোর দাদা!" এই বলে চোখ দুটো আবার কাঁদ-কাঁদ হয়ে উঠ্‌ল। এবার আমার পালা; বল্লাম—"আমার দাদাকে কি তবে তুমি চেন ?"—একটু তামাসা করে বল্লাম—তোমার ভাব দেখে মনে হচ্ছে বুঝি বা কোনও দিন আমার দাদার সঙ্গে তোমার সম্বন্ধ হয়েছিল।" তোমার মেজ'বউ বড় বিষণ্ণ ভাবে বল্লে—"উনি আমার নন্দাই ছিলেন।"

"ছিলেন মানে কি, দিদি ? দাদার ত দুটো বিয়ে হয় নি, আর আমার বউদিদি তো এখনও বেঁচে আছেন।"

"তোর বউদিদিই আমার ননদ।"

"তবে তুমি আমার দাদার শালাজ, আর এতদিন এই কথাটা লুকিয়ে রেখেছিলে!"

"তুই যে ওঁর ভাই, আমি জান্‌ব কি করে?"

"তা ত বটেই। যা হোক, এখন ত জানা শুনা হলো। আজই আমি বউদিদিকে আস্‌তে লিখ্‌ব। কটক থেকে পুরী দু'তিন ঘণ্টার পথ বই ত নয়।"

"না, না, তাকে লিখিস্‌নে। সে আস্‌বে না।"

"আস্‌বে না? তাঁর ভা'জ এখানে বেয়ারাম হয়ে পড়ে আছেন, আর উনি আস্‌বেন না, অসম্ভব কথা। আমার বউদিদি তেমন লোক নন। আর বউদিদিকে লিখ্‌ব, তাঁর দাদাকেও যেন তারে খবর দিয়ে আনিয়ে নেন।"

তোমার মেজ'বউ আর ধৈর্য্য রাখ্‌তে পাল্লেন না। একেবারে আমার দু হাত ধরে বল্লে—"না ভাই নরেন, তোর পায়ে পড়ি। অমন কর্ম্ম করিস্‌ না। আমি রাগ করে বাড়ী থেকে বেরিয়ে এসেছি, তাদের আর এ মুখ দেখাতে পার্‌ব না।"

"শরৎ বলেছে তুমি তোমার খুড়শ্বাশুড়ীর সঙ্গে জগন্নাথ দেখ্‌তে এসেছিলে, রাগ করে এসেছ কে বল্লে?"

"কেউ বলে নি, আমি ত জানি।"

"তোমার মনের কথা ত আর কেউ জানে না। লোকে জানে

তুমি জগন্নাথ দেখ্‌তে এসেছিলে। এখন বাড়ী ফিরে যাবে। তাতে হলো কি ?"

"উনি জানেন।"

"তা হলে এতদিন উনি তোমায় নিতে আসেন নি, তার জন্য মিষ্টার মৈত্রের যে ব্যবস্থা করেছিলাম, তাঁরও সেই ব্যবস্থাই কর্‌ব।"

"নরেন, তুই আমায় ভালবাসিস্‌ বলে ওসব বল্‌ছিস্‌। তুই জানিস্‌ না, আমি কি করেছি। আমি তাঁকে ত্যাগ করেছি।"

আমি হোঃ হোঃ করে হেসে উঠ্‌লাম। "ত্যাগ করেছ কি করে ? হিন্দুর শাস্ত্রে যে ডাইভোর্স্‌ নাই তা কি জান না ?"

"ডাইভোর্স্‌ কি রে ?"

"মুসলমানেরা যাকে তালাক বলে, ইংরেজেরা তাকেই ডাইভোর্স্‌ বলে। হিন্দুর স্ত্রী যে স্বামীকে তালাক দিতে পারে না।"

"কিন্তু আমি ত করেছি তাই।"

"করেছ কি, খুলেই বল না, দেখি।"

"ওঁকে লিখেছি, আমি আর ওঁর স্ত্রী নই।"

"ঐ কথা! সব স্ত্রীই ত রাগ করে ও কথা বলে।"

"ঝগড়ার মুখে ও কথা বলিনি, কোনও দিন ওঁর সঙ্গে আমার ঝগড়া হয় নি। তাই বুঝি ছিল ভাল।"

"তবে কি করেছ?"

"আমি তাঁকে, শান্তভাবে ঠাণ্ডা হয়ে, চিঠি লিখেছি যে আমি তাঁর স্ত্রী নই।"

"আবার একটা বে করতে বল নি ত?"

"তা বল্‌তে যাব কেন? তাঁর ইচ্ছা হয় তিনি কর্‌বেন। সে দায় আমার নয়।"

"ঐ দেখ, তুমি তাঁকে ছাড়নি; ছাড়্‌লে তাঁর বিয়ের কথায় অমন হয়ে ওঠ কেন?"

"না নরেন, সত্যি আমি তাঁকে ছেড়েছি।"

"তিনিও কি তোমায় ছেড়েছেন?"

"তাঁর ছাড়ার অপেক্ষা ত আমি রাখি নি।"

"তবে তিনি যদি না ছাড়েন?"

"তায় কি হয়, আমি যে তাঁকে ছেড়েছি।"

"স্বামী স্ত্রীতে অত সহজে ছাড়াছাড়ি হয় না, দিদি। যে দেশে ম্যাজিষ্টরের কাছে রেজিষ্টারী করে বিয়ে হয়, সে দেশে আবার ম্যাজিষ্টরের কাছে গিয়ে রেজেষ্টারী থেকে নিজেদের নাম খারিজ কর্‌তেও বা পারে। হিন্দু তা পারে না। জান না দিদি, সাত পাক ঘুরে যে বে' হয়, চৌদ্দ পাকেও তা খোলে না।"

"আমি যে তাঁকে ছাড়্‌লাম বলে লিখেছি।"

"লিখেছ তাতে হলো কি? ছেলেটা বেশী বিরক্ত কর্‌লে,

মা যে কতবার বলে মর, মর ; তাতে কি আবার সেই ছেলেকে বুকে টেনে রাখে না ! আমাদের শাস্ত্রে বলে, রাগের মাথায় মানুষ যা বলে তাতে মিথ্যা বলায় পাপ হয় না।"

"আমি যে কি করেছি তুই জানিস্‌নে নরেন, নইলে অমন কথা ভাব্‌তে পার্‌তিস্‌ না।"

"কি করেছ ? ঝগড়াঝাটি করনি ; মারধর করনি ; একখানা চিঠি লিখেছ বই ত নয় ?"

"সে চিঠি দেখ্‌লেও কথা কইতিস্‌ না। চিঠিখানা দেখ্‌বি ? ঐ বাক্সের ভিতরে তার নকল রেখেছি। বের করে নে।"

চিঠিখানা পড়ে বল্লাম, "এই ত, অমন চিঠি আমরাও কত পাই। তাতে হয়েছে কি ?"

এমন সময় শরৎ এসে হাজির হলো।

বিকাল বেলা তোমার মেজ'বউএর আর জ্বর আসে নি। এখানকার ডাক্তার বল্লেন, আর জ্বর হবে না। এখন ওঁকে বাড়ী পাঠাবার ব্যবস্থা কর্‌তে হবে।

৯

বউদিদি,

আজ একটা খুব নতুন খবর আছে। বিন্দু বলে যে মেয়েটা আত্মীয়স্বজনের অত্যাচারে আত্মহত্যা করেছে শুনে তোমার মেজ'বউএর এই বিরাগ হয়েছিল, সে মরেনি। শরৎ

কলকাতা থেকে সে খবর নিয়ে এসেছে। বিন্দু নিজেও তোমার মেজ'বউকে চিঠি দিয়েছে। কি সামান্য ভুল ভ্রান্তি ধরে কত বড় ট্র্যাজেডির (মাপ কর বউদিদি, ট্র্যাজেডির বাঙ্গলা আমি জানি না) সৃষ্টি হতে পারে, এই ঘটনায় তাই বুঝ্‌লাম। ন্দু মরে নি। শরৎ বিন্দুর শ্বশুর বাড়ীর নম্বরটা ভুলে গিয়েছিল। তাই সেই গলিতেই আর একটা বাড়ীতে খোঁজ কর্‌তে গিয়ে জানে, সে বাড়ীর নতুন বউ কাপড়ে আগুন লাগিয়ে স্নেহলতার মতন আত্মহত্যা করেছে। ঐ খবর নিয়ে নিয়ে এসেই ত যত গোল বাধিয়েছে। বিন্দু কেবল মরে নি তা নয়, এখন অতি সুখে আছে। তোমার মেজ'বউকে সে যে চিঠি লিখেছে, সেখানা নকল করে দিলাম, পড়ে দে'খ। রাগ করো না, বউদিদি, বিন্দু যে প্রথমে অতটা গোল বাধিয়ে তুলেছিল, তা তোমার মেজ'বউএর শিক্ষারই গুণে, তার নিজের স্বভাব-দোষে নয়! তোমার মেজ'বউ নিজে এখন একটা বুঝেছেন, নইলে আমি ও কথা কইতাম না। বিন্দু সর্ব্বদাই নিজেকে বড় নিষ্পীড়িত মনে কর্‌ত। তোমার মেজ'বউই এ ভাবটা তার প্রাণে বেশী করে জাগিয়ে দেন। আর যে আপনাকে সর্ব্বদাই নির্য্যাতিত ও নিষ্পীড়িত ভাবে, তার দ্রোহিতা অবশ্যম্ভাবী। সব বিদ্রোহীর ভিতরকার কথাই এই। বিন্দুর কথাও তাই। তোমার মেজ'বউএর কথাও তাই। বিন্দু

এখন এ রোগমুক্ত হয়েছে; তোমার মেজ'বউও ঠাকুরের কৃপায় আরোগ্যের পথে দাঁড়িয়েছেন।

তৃতীয় অধ্যায়।

বিন্দুর পত্র।

শ্রীশ্রীচরণেষু,

দিদি আমি মরি নাই। তোমরা যে খবর পেয়েছিলে সেটা মিছে কথা। আমি যে দিন আবার আমার শ্বশুরবাড়ী ফিরে আসি, তার দুদিন পরে, আমাদের পাশের বাড়ীতে একটী বউ কাপড়ে কেরোসিন দিয়ে আগুন ধরিয়ে আত্মহত্যা করে। তারও নাম বিন্দু ছিল। ওরা আমাদেরই জ্ঞাতি। তারও এই দু'তিন মাস আগে বে হয়। এরই জন্য আমিই মরেছি বলে কথাটা রটে যায়। দিদি, আমি মরি নি। আর এমন সুখে আছি যে মরবার কোন সাধ আমার আর নাই।

ঐ মেয়েটা যখন পুড়ে মরে, আমি দেখেছিলাম। আমার শোবার ঘরের পাশেই ছাদ, আর তার পরেই ওদের ছাদ। তখন রাত দুপোর হবে। আমরা তার চীৎকারে জেগে উঠে, দৌড়ে বাহিরে গিয়ে দেখি, মেয়েটার চারিদিক দাউ দাউ করে

আগুন জ্বলে উঠেছে, আর সে "বাবা গো, আমি মর্‌বো না, আমি মর্‌বো না"—বলে বিকট চীৎকার কচ্ছে। তার মুখের সে ছবি আমার প্রাণের ভিতরে কে যেন ঐ আগুন দিয়ে দেগে দিয়েছে। যখনই মনে হয়, সর্ব্বাঙ্গে ঘাম ছুটে, এত ভয় হয়। আমি ঐ দেখে অজ্ঞান হয়ে পড়ি। উনি আমাকে কোলে করে ঘরে এনে বিছানায় শুইয়ে, চোখে মুখে জল দিয়ে, সারা রাত বাতাস করে, কত রকমে ভুলিয়ে ভালিয়ে আমার ঐ ভয়টা তাড়াতে চেষ্টা করেন। আমি শেষে ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়্‌লাম; আর উনি, ছেলে ভয় পেলে মা যেমন তার গায়ে হাত দিয়ে তাকে ঘুমাতে দেয়, তেম্নি করে সারারাত জেগে আমার গায়ে হাত রেখে, আমার মাথায় বাতাস করে, পাহারা দেন। ভোর বেলা চোখ মেলে দেখি, এই ভাবে বসে আছেন। দিদি, তোমার আশীর্ব্বাদে আমি বড় সুখে আছি।

তুমি আমার দুঃখ অনেক দেখেছ, আমার সঙ্গে সঙ্গে অনেক কেঁদেছ, আমাকে মা'র পেটের বোনের মতন ভাল বেসেছ। জন্মে আমি তার আগে অমন আদর ও ভালবাসা পাই নাই। আর তুমি অমন করে ভালবাস্‌তে বলেই আমার বিয়ে কর্‌তে এত অনিচ্ছা ছিল। তোমার ঐ আদর ছেড়ে পরের বাড়ী যেতে একেবারেই মন চাইত না। তাই তোমার পায়ে ধরে কত কেঁদেছিলাম, বলেছিলাম আমার বিয়ে

দিও না, দাসী করে নিজের কাছে রাখ। আমার রূপ নাই জান্‌তাম। সবাই বল্‌ত অমন কাল মেয়ের কি আবার ভাল বে হয়? আমার বাপ মা নাই। টাকা কড়ি নাই। শুন্‌তাম একরাশ টাকা নইলে কোনও মেয়ের বে হয় না। তাই আমার যখন বিয়ের সম্বন্ধ এল, তখন ভাব্‌লাম যে এর ভিতরে অবশ্য একটা কিছু ভারি গলদ আছে; নইলে অমন কাল মেয়েকে, অমন মাবাপখেগো গরীব মেয়েকে বিয়ে কর্‌তে চায় কে? তাই ভয় হচ্ছিল, কোথায় যাচ্ছি। মনে মনে ভাব্‌লাম অমন কাল মেয়েকে যে বিয়ে কর্‌তে রাজি হয়, না জানি সে কত কুৎসিত। আমার মনের কথা কেউ জানে না, দিদি, কেবল এই আজ তোমায় বল্‌ছি। তোমায়ও এসব কথা কোনও দিন কইতাম না, যদি ঠাকুর আমার ভাগ্যে এত সুখ না লিখ্‌তেন। সুখ পেয়েছি বলেই আজ দুঃখের কথা কইতেও আমার সুখ হয়। কি বল্‌ছিলুম? হাঁ, ঐ আমার বের রাতের কথা। মনে মনে আমার স্বামী অতিশয় কুৎসিত হবে ভেবে রেখেছিলুম বলে, শুভদৃষ্টির সময় আমি জোর করে চোখ দুটাকে চেপে রেখেছিলুম। ছেলেবেলা আঁধার রাতে ঘরের বাহিরে গেলে ভূতের ভয়ে যেমন চোখ বুজে থাক্‌তাম, তেমনি করে চোখ বুজে রইলাম। তার পর বাসর ঘরে গিয়ে আমার ভয় আরও বেড়ে গেল। গল্প শুন্‌তাম বাসর ঘরে কত লোক

থাকে, কত রং তামাসা হয়, আমার বাসরে সে রকম কিছুই হলো না। একজন বুড়ী আমার হাত ধরে নিয়ে বিছানায় বসিয়ে দিয়ে চলে গেল। তার পরে উনি উঠে দরজা বন্ধ করে দিলেন। আমি ভয়ে আড়ষ্ট হয়ে গেলাম। মুখে কাপড় মুড়ি দিয়ে বিছানার এক পাশে কাঠ হয়ে পড়ে রইলাম। একবার আমার হাতখানা এসে ধর্‌লেন, তার পরেই ছুড়ে ফেলে গর্‌গর্‌ কর্‌তে কর্‌তে উঠে গেলেন, আর সারা রাত ঐরূপ গর্‌গর্‌ করে করে পাইচারি করে কাটালেন। মাঝে একবার মনে হ'ল যেন, অনেকগুলি কাচের বাসন ছাতে ছুড়ে ফেলে চুরমার করে ফেল্লেন। আমি বুঝ্‌লাম এ ব্যক্তি পাগল। তার পর দিন যখন খেতে বসেছি, অমনি তেড়ে একেবারে সেখানে এসে উপস্থিত হলেন; আর ভাতের থালা ছুড়ে ফেলে, উনুনে জল ঢেলে, হেঁসেলের ভাতবেন্নুন সব জুতা শুদ্ধ পায় লাথি মেরে চারিদিকে ছড়িয়ে চলে গেলেন। আমি দেখে শুনে ভয়ে ভয়ে প্রাণের দায়ে তোমার কাছে পালিয়ে এলাম। তার পর কি হলো তুমি জান। তুমি আমায় রাখ্‌তে চেয়েছিলে। কিন্তু আমার ভাশুর যখন নিতে এলেন, তখন দেখ্‌লাম তোমাদের বিপদ হ'তে পারে, তাই তাঁর সঙ্গে ফিরে গেলাম। এবারে গিয়ে ওঁর সঙ্গে আমার দেখাই হয় নি। আমি চলে এসেছি শুনে উনিও বাড়ী ছেড়ে চলে যান। তার পর যখন শুন্‌লাম,

আবার ফিরে এসেছেন, তখন আমার পিত্তি শুকিয়ে গেল। তাই আবার পালিয়ে আমার খুড়তাত ভাইদের ওখানে যাই। ওরা যখন কিছুতেই স্থান দিলে না, তখন কাজেই আবার ফিরে আসতে হলো। আমার গাড়ী যখন দরজায় গিয়ে দাঁড়াল, তখন দেখ্‌লাম একটী নতুন লোক আমাকে গাড়ীর দরজা খুলে তুলে নিলেন। আমি ভাব্‌ছিলাম আমার শ্বাশুড়ী বা বাড়ীর ঝি-চাকরাণী বুঝি কেউ এসে দরজা খুল্‌ল; তাই নিঃসঙ্কোচে তার মুখের দিকে চেয়ে দেখ্‌লাম। দিদি, দেখ্‌লাম একজন অতি সুন্দর পুরুষ। যেমন মুখ, তেমনি রং, যেমন কোঁকড়া কাল চুল, তেমনি বড় বড় টানা চোখ; যেমন নাক তেমনি সব। পুরুষের অমন রূপ জন্মে দেখিনি। মিথ্যা বল্‌ব না, দিদি, দেখেই মনে হলো, হা রে কপাল! অমন স্বামী যদি আমার হ'ত! আমি তাঁর পিছু পিছু অন্দরমহলে ঢুক্‌লাম। তখন ইনি ডেকে বল্লেন—"মা, তোমার বউ এসেছে, আমার ঘরেই নিয়ে যাচ্ছি।" গলার স্বরে আমার সর্ব্বাঙ্গ কেমন করিয়া উঠিল। পা যেন আর চলে না। শরীরটা যেন হঠাৎ ভারি হয়ে পড়্‌ল। মনে হলো যেন আমি ভেঙে পড়্‌ছি। তখন তিনি আমার হাত ধরে একেবারে দুতালায় শোবার ঘরে নিয়ে গেলেন। যত্ন করে বিছানায় বসালেন। পাখা নিয়ে দাঁড়িয়ে বাতাস করতে লাগ্‌লেন। তার পর বল্লেন—অমন

মিষ্টিভাবে জন্মে আমার সঙ্গে আর কেউ কথা কয়নি, দিদি, অভিমান করো না, তুমিও কইতে পারনি—"একবার এদিকে এস।" আমি যেন পুতুলবাজির পুতুল সেজেছি। অমনি ধীরে ধীরে উঠে তাঁর সঙ্গে গেলাম। বারান্দায় একখানা কাঠের চৌকি ছিল, আমায় সেখানে বসালেন। তার পর নিজে এক ঘড়া জল এনে আমায় পা ধু'তে দিলেন। আমি লজ্জায় মরে যেতে লাগ্‌লাম, কিন্তু বাধা দিবার শক্তি ছিল না। আমাকে হাতে মুখে জল দিতে বল্লেন, নিজে দাঁড়িয়ে সে জল ঢেলে দিলেন। তার পরে আবার ঘরে এসে, নতুন বাণারসী শাড়ী বের করে বল্লেন, "কাপড় ছাড়, তোমার ফুলশয্যার জন্য এখানি এনেছিলাম, আজই তোমার ফুলশয্যা।" এই বলে বারান্দায় গেলেন। আমি সেই শাড়ীখানি কোনও মতে পল্লাম। হাত পা কিছুই যেন আর আমার নিজের বশে নাই। আমার কাপড় ছাড়া হলে, এক বাক্স গহনা বের করে,—তোমার দেওয়া গহনাগুলি একে একে খুলে ফেলে, নিজের হাতে বালা, বাজু, অনন্ত, চিক, ইয়ারিং পর্য্যন্ত পরিয়ে দিলেন। কতক্ষণ যে এই গহনা পরাতে লাগ্‌ল, বল্‌তে পারি না। এক এক খানি গহনা পরাচ্ছেন, আর অনিমেষে খানিকক্ষণ সে অঙ্গটাকে দেখ্‌ছেন। এক এক বার মনে হতে লাগ্‌ল, বুঝি এ ব্যক্তি সত্যি সত্যি পাগল। আবার মনে হতে লাগ্‌ল, দুনিয়ার সব ভাল লোকের চাইতে আমার এ পাগলই

ভাল, এ পাগলকে গলায় বেঁধেই আমি মর্‌ব। সব গহনা পরান শেষ হলে আমার মুখখানি তুলে ধল্লেন,—আমার তখন চোখ বুজে থাকাই উচিত ছিল, কিন্তু দিদি, পোড়া চোখ তা কল্লে না, চার চক্ষে মিলন হলো। এই আমাদের শুভদৃষ্টি। দিদি, আমার চোখ জলে ভরে আস্‌ছে, আমি যে কাল, আমি নাকি কুৎসিত, তবু ওঁর চক্ষে বুঝি বা আমিও বড় সুন্দর। নইলে ও চোখ আমায় দেখে অমন হয় কেন?

দিদি, ইনি পাগল নন। ছেলে বয়সে একবার বড় মদ গাঁজা খেতে আরম্ভ করেন, তারই জন্য মাঝে ক'দিন একটু ক্ষেপে উঠেছিলেন সত্য। কিন্তু সে প্রায় দশ বার বছরের কথা। এখন তামাক পর্য্যন্ত ছোঁন না। তবে বড় বদ্‌রাগী লোক। রাগলে জ্ঞান থাকে না। আর, দিদি, যে রাগতে জানে না, সে ত পাথর, সে কি ভালবাস্‌তেই জানে? জান কি, আমায় বে কল্লেন কেন? স্নেহলতা মেয়েটা যখন আত্মহত্যা কল্লে, ঐ কথা শুনে তিনি প্রতিজ্ঞা কল্লেন যে, যার কোনও রকমে বরপণ দিবার সম্বল নাই, তেমন বাপের মেয়ে না পেলে বে কর্‌বেন না। তাই খুঁজে খুঁজে ঘটকী আমায় বের কল্লে। এ বিয়েতে তাঁর বাপমায়ের আপত্তি ছিল। তাঁরা প্রথমে টাকা খুঁজ্‌ছিলেন। যখন ছেলে পণ নিয়ে বে কর্‌বেই না কোট করে বস্‌লো, তখন আর কিছু না হউক যার দুপয়সা আছে, বারমাসে তের পার্ব্বণে তত্ব পাঠাতে পার্‌বে,

এমন ঘরের মেয়ে বে করুন, তাঁরা তাই চাচ্ছিলেন। কিন্তু উনি এতেও নারাজ হলেন। তাতেই বাপ বেটাতে ঝগড়া হয় ও বাপ ছেলের বিয়েতে থাক্‌বেন না বলে কাশী চলে যান। আমার শাশুড়ী বাড়ী ছেড়ে গেলেন না বটে, কিন্তু আমি যে কুলীনের মেয়ে এ অপরাধটা ভুল্‌তে পাল্লেন না। তারই জন্য আমাকে হাড়ীবাগ্দীর মেয়ের মতন পিতলের থালাতে ভাত দিয়েছিলেন। হয় ত ভেবেছিলেন, অতি গরীবের ঘরের মেয়ে, তাতে আবার বাপ মা নাই, এরূপেই বুঝি আমি লালিতপালিত হয়েছি; তারই জন্য উনি অমন রেগে উঠেছিলেন। মাকে ত আর কিছু মুখে বল্‌তে পারেন না, তাই কতকটা আমার উপর দিয়ে, আর কতকটা থালাবাসন ও হাঁড়ীকুড়ির উপর দিয়ে সে রাগটা চালিয়ে দিলেন। আর উনি যে সব গহনা দিয়েছিলেন, ওঁর মা আমায় সেগুলি পরিয়ে দেন নি বলে বিয়ের রাতে অমন করে রেগে গিয়েছিলেন।

দিদি, আমি ভাবি, তোমরা যদি আমায় সত্যি সত্যি রাখ্‌তে, আমার খুড়তুত ভাইয়েরা যদি আমায় স্থান দিত, আর একমুঠা ভাত যেথানেই হউক আমার মিল্‌তই—তাতে আমার কি সর্ব্বনাশই হতো। অমন দেবতার মতন স্বামীকে পেতাম না। আর স্বামীকে পেয়েছি বলে, শ্বশুর, শাশুড়ী সবাইকে পেয়েছি। ভাশুর, যা, ভাশুর-পো, ভাশুর-ঝী, সকলে আমার কতই আপনার

হয়ে গেছে। দিদি, আমি নিজেকে ওদের সেবায় নিযুক্ত করে, ওদের মাঝে আপনাকে হারিয়ে ফেলেছি। এখন আর আমার নিজের কোনও দুঃখ নাই। সুখ আমার উপ্‌চে পড়্‌ছে। দিদি, অনেক দিন তোমার বুকে মাথা রেখে আমি আমার ছোট্ট দুঃখের কান্না কেঁদেছি, আজ বড় সাধ যায়, ঐ বুকে ছুটে গিয়ে এইবার আমার সুখের কান্না কাঁদি। আমার দুঃখে চিরদিন দুঃখ পেয়েছ, এবার আমার সুখ দেখে সুখী হও।

শুন্‌লাম আমি মরেছি শুনে তুমি বিবাগী হয়ে শ্রীক্ষেত্রে চলে গেছ। আমি যখন সত্যি সত্যি বেঁচে আছি, তখন তুমি আর ঘর বাড়ী ছেড়ে থাক্‌বে কেন? আর মরেই কি কখনও তোমার দুঃখে আমার সুখ হতো? স্বামীর কোলে মাথা রাখাতে যে কি সুখ, তা ত তুমি জান। তুমি আমার জন্য এই স্বর্গসুখও ছেড়েছ, শুনে অবধি আমার নিজের সুখ যেন আধখানা হয়ে গেছে। তুমি শিগ্‌গির ফিরে এস। তোমায় বড় দেখ্‌তে ইচ্ছে করে। লক্ষ্মী দিদি আমার, শিগ্‌গির ফিরে এস। আমার কোটী কোটী প্রণাম জানিবে।

তোমারই সেবিকা
বিন্দু।

চতুর্থ অধ্যায়

মেজ বউএর পত্র

ঠাকুর-ঝি,

তোমার চিঠি পেলাম। তোমার ঠাকুর-পোর কথা কি আর লিখ্‌ব, আমার জন্য সে যা করেছে, শরৎ তা কর্‌তে পার্‌ত না। ভগবান্ তাকে এনে জুটিয়েছিলেন বলেই তোমার মেজ'বউ এখনও বেঁচে আছে।

আমাকে তোমার ওখানে যেতে বল্‌ছ। আমি কি করেছি তা জান্‌লে এ পোড়ারমুখীর মুখ আর দেখ্‌তে চাইতে না! অমন দেবতার মত স্বামী, তাঁকে কতই না অনাদর, কতই না অপমান করেছি। শাস্ত্রমতে আমি পরিত্যক্তা। কারণ অপ্রিয়ভাষিণী স্ত্রীকে তৎক্ষণাৎ পরিত্যাগ কর্‌বে, শাস্ত্রে এই কথাই বলে।

আমি তোমার দাদাকে পরিত্যাগ করেছি। তিনি আমায় ছাড়েন নি, আমিই ছেড়ে এসেছি। আমি তীর্থ কর্‌তে আসি নি, ওটা একটা ছুতা মাত্র। আমি আর তোমাদের সম্পর্ক রাখ্‌ব না বলে এসেছি। স্ত্রীলোকের মনের যে অবস্থা হ'লে আজকাল তারা নিজের কাপড়ে আগুন লাগিয়ে পুড়ে মরে, আমি সেই মন নিয়ে বাড়ী ছেড়ে আসি। মর্‌তে সাহস হয় নি ব'লে মরি নি। সতী স্ত্রী আপনি মরে, আমি তা করি নি, স্বামীর ভালবাসাটাকে হত্যা কর্‌বার চেষ্টা করেছি।

ঠাকুর-ঝি, তোমরা সতী সাধ্বী, আমি যে তোমাদের অস্পৃশ্যা। আমায় মাপ কর। আমি তোমাদের কাছে এ মুখ দেখাতে পার্‌ব না।

স্বামীপুত্র নিয়ে সুখে থাক, এই প্রার্থনা করি।

পঞ্চম অধ্যায়

ঠাকুর-পোর পত্র

বউদিদি,

আমি ত কিছুতেই তোমার মেজ’বউকে বাড়ী ফিরে যেতে রাজি করাতে পাল্লাম না। তোমাকেই আস্‌তে হবে। তোমার দাদা যদি আসেন, আরও ভাল হয়। তোমাদের প্রতীক্ষায় রইলাম।

ষষ্ঠ অধ্যায়

ঠাকুর-ঝীর পত্র

মেজ’বউ,

তুমি যখন এলে না, আমরাই তখন যাচ্ছি। মেজদাদাকেও লিখেছি, তিনি রবিবারে এখানে আস্‌বেন। উনিও শালাজকে দেখ্‌তে যাবেন। তিন দিনের ছুটী নিয়েছেন। আমরা তিন জনে সোমবার প্রাতে তোমার দোরে গিয়ে অতিথি হবো। জ্ঞাতার্থে নিবেদনমিতি।

সপ্তম অধ্যায়।

আবার স্ত্রীর পত্র।

ঠাকুর-ঝীর পত্রে জান্‌লাম, এই সোমবারে তুমি এখানে আস্‌বে। তোমার পায়ে পড়ি, এস না—আমিই যাচ্ছি—আমার জন্য এই কষ্ট স্বীকার করে, এ হতভাগিনীকে আর নতুন করে অপরাধিনী করো না।

তুমি এস না বল্‌ছি; কিন্তু তোমার কাছে কোনও কথা গোপন কর্‌ব না। তুমি আস্‌বে শুনে আমার প্রাণটা যে কি করে উঠ্‌ল, তোমায় বুঝাতে পার্‌ব না। তুমি আস্‌বে বলেই আমি ফিরে যেতে সাহস পাচ্ছি। নইলে বাকী জীবন হয় ত এমনি করে এই তুঁষের আগুনে পুড়ে মর্‌তে হতো। তুমি আস্‌ছ শুনে বুঝ্‌লাম তুমি তোমার এ কুলত্যাগিনী স্ত্রীকে পরিত্যাগ কর নি। আজ ঈশ্বরের দয়াতে আমার সত্য বিশ্বাস জন্মাল। লোকে যতই পাপ করুক না কেন, তিনি যে কাউকে ছাড়েন না, তোমার এ ক্ষমা দেখে তাই বুঝ্‌লাম।

আর, সত্যি বল্‌ছি, ঈশ্বর কে, তা ত আমি জানি না। এক জন মনগড়া ঠাকুরের পায়ে এতকাল জীবনের সুখদুঃখের কথা বলেছি, কিন্তু এত দিন পরে আমার সত্য ঠাকুরকে আমি পেলাম।

তোমায় যতদিন আমি কেবল আমারি মতন একজন মানুষ বলে ভাবতাম, ততদিন আমি আমার সত্য ঠাকুরকে পাই নাই। আর মানুষ ভেবেই ত তোমায় এত অযত্ন, এত তুচ্ছতাচ্ছিল্য করেছি। পনর বছর কাল তোমার ঘর কল্লাম, কিন্তু এক দিনও তোমার পানে তাকাই নাই, কেবল নিজেকে নিয়েই ব্যস্ত ছিলাম। নিজের ক্ষুদ্র বুদ্ধির অহঙ্কারই করেছি, তোমার ঐ বিশাল জ্ঞানের দিকে তাকাই নাই; আপনার ভোগটাকেই বড় ভেবেছি, তোমার ত্যাগকে লক্ষ্য করি নাই; কেবল পাবার জন্যই ছটফট্ করেছি, কোনও দিন তোমায় সত্যভাবে কিছু দিই নাই। এবার এই কলঙ্কের বোঝা মাথায় নিয়ে বুঝ্‌লাম, দিয়েই সুখ, পেয়ে নয়; ত্যাগেই শান্তি, ভোগে নয়। যে আপনাকে বড় করে, সেই ছোট হয়ে যায়, যে নিজেকে ছোট করে, সেই বড় হয়ে উঠে। আমি তোমার সঙ্গে টক্কর দিয়ে তোমার সমান হতে গিয়ে তোমাকেও ধর্‌তে পাল্লাম না, নিজেকেও রাখ্‌তে পাল্লাম না। আজ এই কলঙ্কের কালি মেখে, তোমার চরণের ধূলি হয়ে, তোমাকেও ধরেছি, নিজেকেও পেয়েছি। আমি বার বছরের ছোট্ট বালিকা তোমাদের এত বড় পরিবারের মধ্যে এসে পড়্‌লাম। কিন্তু তোমাদের বিশালত্বের ভিতরে আপনার ক্ষুদ্রত্বকে হারাতে পাল্লাম না। লোকে বল্‌ত আমার রূপের কথা, অমন রূপ

বাঙ্গালীর ঘরে হয় না—আমি তারই গর্ব্বে ফেঁপে উঠ্‌লাম। মা বাবা বল্‌তেন আমার বুদ্ধির কথা, আমি সেই অহঙ্কারেই ঘট হয়ে বসলাম। তুমি শিখালে আমায় লেখাপড়া, আমি তাই নিজেকে বিদ্বান্ ভেবে একেবারে টঙ্গে চড়িলাম। অন্য লোক হলে কত ঝগড়াঝাঁটি হতো। কিন্তু তুমি একদিন একটা কড়া কথা পর্য্যন্ত বল নি। যখন বড় অন্যায় করেছি, মুখখানা কেবল একটু ভারি হতো। এত করে তোমায় কষ্ট দিয়েও আমি যখন যা চেয়েছি তুমি তাই দিয়েছ। কোনও দিন কিছুতে 'না' করনি। 'না' কথাটা বিধাতা তোমায় শিখান নি। বাড়ীর যে যা ইচ্ছা তাই করে, তুমি কোনও দিন কারও ইচ্ছার প্রতি-রোধ কর নি। আমি ভাবতাম তোমার পুরুষত্ব নাই। ভেবে দেখিনি যে, এই দুনিয়ার মালিক যিনি তিনিও ত অমনি ভাবেই চুপ করে বসে আছেন। তুমি ভাইদের মধ্যে সকলের চাইতে বেশী রোজগার কর; তুমি যদি কোনও বিষয়ে কথা কও, পরিবারে শান্তি থাক্‌বে না। যার যত শক্তি বেশী, যে যত কর্ম্মী বড়, সে তত চুপ করে থাকে। এই মোটা কথাটা আমি তখন বুঝি নি। আমি নিজেকে তোমা থেকে কেবলই আলাহিদা করে দেখ্‌তাম বলে, তোমার মহত্ত্ব যে কত ও কোথায় তা বুঝ্‌তে পারি নি। তাই আমার এ দুর্গতি। আমি সব ছোট জিনিষকে বড় করে তুলতাম, তাই তুমি যে অত বড় তা

বুঝিনি, তোমাকেও ছোট বলে ভেবেছি। এই করে জীবনের এই পনর বছর খুইয়েছি। সব জীবনটাই খোয়াতে বসেছিলাম।

আমার সকল অপরাধের কথা ত শুন নি। তোমাকে ছেড়ে এসে আমায় কি অপমান সহিতে হয়েছে, তুমি জান না। সে দিন যদি তোমার বোনের দেবর নরেন আমার খোঁজে এসে ঐ অপমান থেকে আমায় না বাঁচাত, তাহলে এই সমুদ্রেই চিরদিনের মতন মৃণাল ডুবে মরিত। অরক্ষিতা স্ত্রীর অঙ্গ পরপুরুষে স্পর্শ কল্লে অনেক স্বামী শুনেছি তাকে আর গ্রহণ করে না। অপরের কথা কি, স্বয়ং রামচন্দ্র পর্য্যন্ত করতে চান নি। আমায় কি তুমি গ্রহণ করবে? এই কথাটা তোমায় না বলে আমি তোমার কাছে যেতে পারি না।

বড় সাধ হয়েছে এবার যদি তুমি এ কলঙ্কিনীকে আবার চরণাশ্রয় দাও তবে তোমার মধ্যে ও তোমার পরিবার পরিজনের মধ্যে একেবারে ডুবে গিয়ে এ নারী-জন্মটা সার্থক করি। বিন্দি আমাকে এই শিক্ষা দিয়েছে। সে নিজেকে নিঃশেষে বিলাইয়া দিয়া—সত্যকে পেয়েছে আর আমি নিজেকে নষ্ট করতে বসে সত্যকে দেখেছি। তুমি আমায় রাখ বা ছাড়, যাই কর না কেন, আমি তোমারই চিরদিনের চরণাশ্রিতা।

মৃণাল।

কল্যাণী

১

এবারে পূজার সময় পুরুলীয়া গিয়াছিলাম। ছেলেরা ধরিয়া পড়িল, একদিন রাঁচি যাইতে হইবে। রাঁচির পথ নাকি বড় সুন্দর। বাঙ্গালা দেশের আশে-পাশে অমন ঘন নিবিড় জঙ্গল আর কোথাও নাই। রাঁচি রওয়ানা হইলাম বটে, কিন্তু রাঁচি দেখা হইল না। মাঝ-পথে এঞ্জিন ভাঙ্গিয়া গাড়ী আট্‌কাইয়া রহিল। আমার পক্ষে ভালই হইয়াছিল। এটি না হইলে কল্যাণীর সঙ্গে দেখা হইত না।

যাত্রীরা অনেকেই নামিয়া পড়িল। আমরাও নামিলাম। সেখানটাতে কোনও ষ্টেশন ছিল না। কাছে জনমানবের বসতি নাই। রেলের দুধারে কেবল পাহাড়, খাদ, আর শালবন। লাইনের ধারে ধারে বেড়াইয়া আমরা বনের শোভা দেখিতে লাগিলাম। হঠাৎ গৃহিণী বলিলেন—দেখ, দেখ, ঐ গাছতলায় যেন চাঁদের হাট মিলিয়াছে। চাহিয়া দেখিলাম, তার মাঝখানে দাঁড়াইয়া কল্যাণী। কল্যাণীকে পঁচিশ বৎসর পরে দেখিলাম। আমি আমার কাজে নানাস্থানে ঘুরিয়া বেড়াই। কল্যাণীও কলিকাতায় কচিৎ কখনও যায়।

চাঁইবাসাতে বাড়ী করিয়াছে, সেখানেই থাকে। পঁচিশ বছর পরে দেখিলাম বটে, কিন্তু মনে হইল কাশীতে পঁচিশ বছর আগে যেমনটি দেখিয়াছিলাম, আজ যেন ঠিক তেমনটিই রহিয়াছে। তার সে স্বাস্থ্য, সে সৌন্দর্য্য, সে কান্তির কিছুই কমে নাই, কেবল যাহা অপরিস্ফুট ছিল, তাহা যেন আরো ফুটিয়াছে, যাহা অপরিপক্ব ছিল, তাহা পাকিয়াছে, যাহা একটু চঞ্চল ছিল, তাহা স্থির হইয়াছে। তার আশে-পাশে আটটি সন্তান। বড়টির বয়স ছাব্বিশ, ইহা জানিতাম। ছোটটিকে দেখিয়া মনে হইল, চারি পাঁচ বৎসরের। ছেলেরা কেউ বা দাঁড়াইয়া আছে, কেউ বা ঘাসের উপরে বসিয়াছে, আর বড়টী মা'এর পার কাছে, আপনার বাহুতে ভর করিয়া একটু হেলিয়া পড়িয়াছে। এই চাঁদের হাট দেখিয়া মনে মনে আনন্দস্বামীকে প্রণাম করিলাম।

২

কল্যাণীকে তার বাল্যকাল হইতেই আমি চিনি। কল্যাণীর পিতা, রাধামাধব বাবু আমাদের কালেজের ইংরাজি অধ্যাপক ছিলেন। কিন্তু তিনি কোন্ বিদ্যা যে জানিতেন না, বলিতে পারি না। কালেজে আমরা তাঁর নিকটে ইংরাজিই পড়িতাম, কিন্তু বাড়ীতে যাইয়া দর্শন, ইতিহাস, গণিত, এমন

কি সংস্কৃত কাব্য এবং জড়-বিজ্ঞান পর্য্যন্ত রীতিমত পড়িতাম। পড়ান'তে তাঁর কোনও দিন ক্লান্তিবোধ হইত না। কালেজের অধ্যাপকেরা কেবল নোট লিখাইয়া দিতেন। অনেকেই এগুলি মুখস্থ করিয়া পাশ হইয়া যাইত। রাধামাধব বাবুর কাছে যারা পড়িতে যাইত, তাদের নোট মুখস্থ করিতে হইত না, তারা প্রত্যেক বিষয়ে মূলতত্ত্বগুলি নিজের জ্ঞানে ধরিতে পারিত। আর তাঁর পড়াইবার ধরণটা এমন ছিল যে, তাহাতে সকল বিষয়ই বড় মিষ্ট হইয়া উঠিত। রাধামাধব বাবুর একমাত্র সন্তান কল্যাণী। ছেলেবেলা কল্যাণী অনেক সময় বাবার কাছে বসিয়া তাঁর এ সকল অধ্যাপনা শুনিত।

সেই সূত্রেই কল্যাণীর সঙ্গে আমার পরিচয়। সে প্রথম পরিচয়ের কথাটা এখনও মনে আছে। আমি সবে এণ্ট্রেন্স পাশ করিয়া কলিকাতায় আসিয়াছি। রাধামাধববাবু একদিন আমার একটা ইংরাজি রচনা বাড়ী লইয়া গেলেন। আমাকেও সন্ধ্যার পরে তাঁর বাড়ী যাইতে বলিলেন। তখন তিনি শান্‌কিভাঙ্গায় থাকিতেন। একটা ছোট দুতালা বাড়ী। আমি গিয়া দরজার কড়া নাড়িলাম। "কে ও" বলিয়া একটি আট-নয় বৎসরের বালিকা আসিয়া দরজা খুলিয়া দিল। "ভিতরে আসুন" বলিয়া সে আমাকে হাত ধরিয়া টানিয়া রাধামাধব বাবুর বসিবার ঘরে লইয়া গিয়া বলিল—"বাবা বাড়ী নাই।" কল্যাণীর সঙ্গে সেই আমার প্রথম পরিচয়।

সেই অবধি আমি একরূপ রাধামাধব বাবুর পরিবারভুক্ত হইয়া গেলাম। যখন তখন তাঁদের বাড়ী যাইতাম। অর্দ্ধেক দিন সেইখানেই খাইতাম। কল্যাণী আমাকে দাদা বলিয়া ডাকিত, সত্যসত্যই আমাকে তার নিজের সহোদরের মতন দেখিত। বড় হইলেও এ সম্বন্ধের ব্যতিক্রম ঘটিল না। আমারও নিজের ছোট বোন কেউ ছিল না; কল্যাণীকে পাইয়া আমার সে অভাব দূর হইল।

আমি ক্রমে এম্, এ পাশ করিয়া বছরখানেক কলিকাতাতেই শিক্ষকতা করি। তার পর, ডিপুটী হইয়া কলিকাতা ছাড়িয়া গেলাম। কল্যাণীর বয়স তখন ষোল সতর হইবে। কিন্তু রাধামাধব বাবুকে সে জন্য কোনও দিন চিন্তিত দেখি নাই। প্রথম প্রথম কল্যাণীর বিবাহের কথা উঠিলে তিনি বলিতেন ছেলের পঁচিশ ও মেয়ের ষোল বছরের কমে কিছুতেই বিবাহ হওয়া উচিত নয়। লোকে বলিত—সমাজে এ নিয়ম চলিবে না। রাধামাধব বাবু বলিতেন, সমাজে যাই বলুক শাস্ত্রে এই কথাই বলে। তাঁর বন্ধু বান্ধবেরা বলিতেন—আজকালকার হিন্দুসমাজে এত বড় আইবুড়া মেয়ে রাখা অসম্ভব। রাধামাধব বলিতেন—আমরা কুলীন, আমাদের ঘরে চিরদিনই আইবুড়া মেয়ে থাকিত। ষাট বৎসর বয়সে আমার নিজের পিসীমার গঙ্গালাভ হয়, তাঁর বিবাহ হয় নাই। এ সকল কথা শুনিয়া লোকে রাধামাধব বাবুকে

কেউ বা খৃষ্টীয়ান, কেউ বা ব্রাহ্ম ভাবিত। তাঁর নিজের লোকেরাও ভাবিতেন তিনি ক্রমে ব্রাহ্মসমাজে ঢুকিয়া পড়িলেন।

চা'র বৎসর পরে আমি পূজার সময় কলিকাতায় যাইয়া দেখি, কল্যাণীর সম্বন্ধ আসিয়াছে। বরটী আমার বিশেষ পরিচিত। কালেজে সে আমার নীচে পড়িত, কিন্তু আমরা এক মেসেই থাকিতাম। সেও কুলীন ব্রাহ্মণ; এম, এ পাশ করিয়াছে। দেশে বিষয়-আশয় বেশ আছে, সংসারে তার আর কেউ নাই। অল্পবয়সেই পিতৃমাতৃহীন হয়। বিধবা পিসী তাকে মানুষ করেন, পিসাত ভাই তার বিষয় দেখিতেন। অল্প দিন হইল দুজনাই মারা গিয়াছেন।

এ সম্বন্ধ যখন আসে, আমি তখন রাধামাধব বাবুর কাছেই বসিয়াছিলাম। তিনি চিঠিখানা আমাকে পড়িতে দিলেন। পড়া শেষ হইলে চোখ তুলিয়া দেখিলাম—রাধামাধব বাবুর চোখ ছল ছল করিয়া আসিয়াছে।

পাত্রের নাম ললিত। ললিত সদ্বিদ্বান্, সচ্চরিত্র, সদ্বংশজ, সাংসারিক অবস্থা বেশ ভাল। রাধামাধব বাবু কল্যাণীর বিবাহের আশাই একরূপ ছাড়িয়া বসিয়াছিলেন। বিধাতা এমন বর আনিয়া দিবেন, ইহা তিনি কোনও দিন ভাবেন নাই।

চিঠিখানি লইয়া তিনি বাড়ীর ভিতরে গেলেন। আমাকেও ডাকিয়া নিলেন। কল্যাণীর মা ললিতকে বেশ জানিতেন।

লিত এক সময় তাঁর বাড়ীর ছেলের মতই হইয়া পড়িয়াছিল। ন তখন তাঁদের বাড়ী যাইত। কল্যাণীও নিঃসঙ্কোচে তার সঙ্গে শিত। কিছুদিন পূর্ব্বে ললিত যাওয়া-আসা একেবারেই বন্ধ রিয়া দেয়। ডাকিলেও ওজর আপত্তি তুলিয়া এড়াইতে চেষ্টা রিত। ললিতের কি হইয়াছে, বলিয়া রাধামাধব বাবুর গৃহিনী ঝে মাঝে দুঃখ করিতেন। কল্যাণীর মা এই প্রস্তাবে খুবই া হইলেন। কেবল "কিন্তু" দিয়া বলিলেন, "আর সবই খুব ন, ওর সংসারে যে আর কেউ নাই আমি তাই ভাবৃছি।"

একটু পরেই কল্যাণী মায়ের কাছে আসিল। রাধামাধব বাবু র হাতে চিঠিখানা দিলেন। চিঠিখানা পড়িতে পড়িতে তার লাল হইয়া উঠিল। মাথা হেঁট করিয়া সে চিঠিখানা ফিরাইয়া । নির্ব্বাক্, নিশ্চল হইয়া বসিয়া রহিল। রাধামাধব বাবু াসা করিলেন, "তোর মত আছে ত?"

কল্যাণীর মা বলিলেন—তোমার যত সৃষ্টিছাড়া কথা। ার আমার মত হলে ও' কি আর 'না' বল্‌বে?

রাধামাধব বাবু বলিলেন—কচি বয়সে বিয়ে দিলে অন্য কথা ; আমার মেয়ে বড় হয়েছে। লেখাপড়াও শিখেছে। ভাল-বুঝ্‌বার শক্তি জন্মেছে। আগেকার কাল থাকিলে সে রা হইতে পারিত। তার মত না লইয়া কি আমি কিছু করিতে পারি?

কল্যাণীর মা বলিলেন—পুরুষগুলো কি একেবারে দিনকাণা ? ওর মুখ দেখে কি বুঝ্‌ছ না, ওর অমত নাই।

মায়ের কথা শুনিয়া কল্যাণী সেখান হইতে সরিয়া পড়িল।

রাধামাধব বাবু তখন তাঁর মায়ের কাছে গেলেন। প্রতিদিন প্রাতে বৃদ্ধা গঙ্গা-স্নান করিয়া আসিলে রাধামাধব বাবু যাইয়া তাঁর পদধূলি লইয়া আসিতেন। এটিই তাঁর একমাত্র প্রকাশ্য সন্ধ্যাবন্দনা ছিল। আজিও মায়ের পদধূলি লইয়া বলিলেন—মা, কল্যাণীর সম্বন্ধ আসিয়াছে।

বৃদ্ধা কথাটা শুনিয়া চমকিয়া উঠিলেন। মুখ বিষণ্ন হইল। কল্যাণীর বিবাহ হইবে, এ আশা তিনি একেবারে ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। মনে মনে ভাবিতেন, যদি কোনও দিন হয়, তবে ব্রাহ্মসমাজেই হইবে। আর তাঁর মৃত্যুর অপেক্ষাতেই রাধামাধব বাবু ব্রাহ্মসমাজে ঢুকিয়া পড়েন নাই; কিন্তু কন্যার বিবাহের খাতিরে বুঝি বা সে দেরিটুকুও আর সহিল না।

রাধামাধব বাবু মায়ের মনোভাব বুঝিলেন। ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন,—মা তোমার জাত যাবার ভয় নাই। বর বামুন, আমাদের পাল্‌টি ঘর, তুমি তাকে জান।

বৃদ্ধা চমকিয়া উঠিলেন,—বলিলেন, আমি চিনি? সে কে?

রাধামাধব বাবু বলিলেন—ললিত।

বৃদ্ধা বলিলেন—আমাদের ললিত!

তাঁর মুখ অপূর্ব্ব-উল্লাসে ভাসিয়া উঠিল, দুই চোখ জলে ভরিয়া গেল। বলিলেন—কল্যাণীর জন্য মনে মনে এই বরটি চাহিয়া আমি এ দুবছর কাল প্রতিদিন শিবের মাথায় বেলপাতা দিয়াছি। ঠাকুর দুঃখিনীর মান রাখলেন।

৩

কল্যাণীর বিবাহে আমি উপস্থিত ছিলাম। রাধামাধব বাবুর গুরুদেব এ বিবাহে পৌরোহিত্য করেন। আনন্দস্বামী রাধামাধব বাবুর কুলগুরু নহেন। বহুদিন পূর্ব্বে একবার গয়াধামে রাধা-মাধব বাবু তাঁর দর্শন লাভ করেন। আনন্দস্বামী বৈষ্ণব সন্ন্যাসী, অনেকে তাঁহাকে সিদ্ধ মহাপুরুষ বলিয়া জানিত। তাঁর নিকটে স্বামীস্ত্রীতে মন্ত্রদীক্ষা লইয়া, সেই অবধি রাধামাধব বাবু নামব্রহ্মের উপাসনা আরম্ভ করেন। কল্যাণীর বিবাহ ঠিক হইলে, তিনি গুরুদেবকে স্মরণ করিলেন। শিষ্যের আগ্রহে আনন্দস্বামী কলিকাতায় আসিলেন। রাধামাধব তাঁহাকেই কল্যাণীর বিবাহ দিবার জন্য ধরিয়া পড়িলেন। বলিলেন—বাবা, দেশে যে আর ব্রাহ্মণ নাই, আপনার মুখেই একথা শুনেছি। ব্রাহ্মণ নহিলে কল্যাণীর বিবাহ দেয় কে? আনন্দস্বামী বলিলেন, কাশী হইতে বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ আনাইয়া দিবেন। রাধামাধব বলিলেন—বেদজ্ঞ হইলে কি বাবা মন্ত্রজ্ঞ হয়? বেদ ত আজকাল যে সে পড়ে;

কিন্তু তার অর্থ জানে কয় জন ? আর যারা অর্থ জানে, তারাও ত এ সকলের মর্ম্ম বুঝে না। যদি ক্বচিৎ কেউ মর্ম্মও বুঝে, তারাও ত মন্ত্রের শক্তি ফুটাইতে পারে না। এটী কেবল আপনিই পারেন। আপনি কল্যাণীর বিয়ে না দিলে তার বিয়ে হয় না। আনন্দস্বামী শিষ্যের আব্দার অগ্রাহ্য করিতে পারিলেন না। নিজেই কল্যাণীর বিবাহে পৌরোহিত্য করিলেন। আর বিবাহের পূর্ব্বে সাত দিন ধরিয়া কল্যাণীকে বিবাহের শাস্ত্রীয় বিধি ও বৈদিক মন্ত্রাদি ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিলেন।

রাধামাধব বাবু কল্যাণীকে বেশ ভাল লেখাপড়া শিখাইয়াছেন। সাহিত্য, ইতিহাস, দর্শন, এমন কি, মোটামোটি জড়-বিজ্ঞান এবং শরীরতত্ত্ব পর্য্যন্ত সে শিখিয়াছে। গুরুদেবের মুখে হিন্দু বিবাহের মন্ত্রের ব্যাখ্যা শুনিয়া সে বিস্ময়ে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। এ যে কেবল ধর্ম্ম নয়, কিন্তু জীববিজ্ঞান; শরীরতত্ত্ব, মনস্তত্ত্ব, রসতত্ত্ব, সমাজ-বিজ্ঞান, এমন কি আধুনিক ইউজেনিক্স্ বা সুপ্রজনন-বিদ্যার মূলতত্ত্বগুলির উপরে হিন্দুর বিবাহ-সংস্কার প্রতিষ্ঠিত। এ সকল কথা বিবাহের মন্ত্রের ভিতরে লুকাইয়া আছে। এতদিনে বিবাহ ব্যাপারটী যে কি কল্যাণী বুঝিতে পারিল। বুঝিয়া তাহার প্রাণ দমিয়া গেল।

যথাসময়ে আনন্দস্বামী কল্যাণীর বিবাহ দিলেন। যাঁরা এ বিবাহে উপস্থিত ছিলেন, তাঁরা একবাক্যে বলিয়াছেন, জন্মে

কখনও এমন বিবাহ দেখেন নাই। এই মহাপুরুষ যখন ললিতকে মন্ত্রগুলি পড়াইতে লাগিলেন, তখন প্রত্যেকটী মন্ত্র যেন সজীব হইয়া উঠিয়াছিল। আর এই সকল মন্ত্র-প্রভাবে কল্যাণীর ফুল্ল-যৌবনের উচ্ছ্বসিত রূপরাশি অলৌকিক লাবণ্যে উদ্ভাসিত হইয়া তাহাকে সাক্ষাৎ ভগবতীর মতন দেখাইয়াছিল।

কল্যাণীর বিবাহে সকলের চাইতে বেশী আনন্দ হইল তার পিতামহীর। এই জন্যই যেন তিনি এতকাল পুত্রের সংসারে বাঁধা পড়িয়াছিলেন। কল্যাণী স্বামীর ঘর করিতে গেলে, তার ঠাকুরমাও কাশী চলিয়া গেলেন।

৪

কল্যাণীর বিবাহ হইয়া গেলে আমি আমার কর্ম্মস্থলে ফিরিয়া গেলাম। ললিত বয়সে আমার ছোট হইলেও, সখ্যের হিসাবে একই বন্ধুদলভুক্ত ছিল। একটী বন্ধু লিখিলেন—ললিতের উদ্বাহ শেষে উদ্বন্ধনে দাঁড়াইয়াছে। আমরা তার টিকি পর্য্যন্ত আর এখন দেখিতে পাই না। তার এখন—

উঠিতে কল্যাণী বসিতে কল্যাণী
কল্যাণী হইল সারা,
কল্যাণী ভজন কল্যাণী পূজন
কল্যাণী নয়ন-তারা।

আমি লিখিলাম, শৈশবে যেমন দাঁত ওঠা, যৌবনে সেইরূপ বিয়েটাও কারও কারও হয়। টিদিং আর বিয়ে—দুয়েতেই ভারি কনষ্টিটিউষন্যাল্ ডিষ্টার্‌বেন্‌স্ হয়। ললিতেরও দেখ্‌ছি তাই হয়েছে। ললিতকে লিখিলাম—লোকে বলে তোমার নাকি বিয়ে হয় নাই, মৃত্যু হয়েছে। কল্যাণী কি তোমাকে গিলিয়া বসিয়াছে, না তুমিই তাকে গিলিয়া এখন অজগর হইয়াছ, আর নড়িতে চড়িতে পার না। যেই যাকে গিলিয়া থাক্, হজম করা শক্ত হবে। কল্যাণী কথাগুলি পড়ুক, এই জন্য পোষ্ট কার্ডে লিখিলাম। তাহাই হইল। কল্যাণী আমাকে লিখিল—

"আপনার পোষ্টকার্ড খানা আমার হাতে পড়িয়াছে। আমি কি বলিব, সত্যি আমার মরিতে ইচ্ছা হয়। আমি ওঁকে কত বলি—তুমি তোমার বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গ একেবারে ছাড়্‌লে, তাঁরা আমাকে কি যে ভাব্‌ছেন, তা তুমি দেখ না। উনি বলেন—ওদের হাল্‌কা কথাবার্ত্তায় তাঁর মাথা ধরে। আমি জমিদারীতে যেতে বলি। তিনি বলেন, ম্যাজিষ্ট্রেটের সঙ্গে তাঁর ঝগড়া, কোন্ ফ্যাসাদে ফেলে জেলে পূরে দিবে, তার জন্য যান না। আমি বলি, আর কিছু না করুন, প্রতিদিন ময়দানে গিয়ে হাওয়া খেয়ে আসা উচিত। তিনি বলেন—হাঁট্‌লে তাঁর প্যাল-পিটেশন হয়। আমি মাঝে মাঝে বাপের বাড়ী যাই, কিন্তু গিয়ে দু'দণ্ড থাক্‌তে পারি না—তাগিদের উপর তাগিদ যায়। আমি

কি করি বলুন? আমি ত হার মেনেছি। আপনি যদি কিছু কর্‌তে পারেন, তারই জন্য আপনাকে লিখ্‌ছি।”

৫

বৈশাখ মাসে ঈষ্টারের ছুটিতে কল্যাণীর বিবাহ হয়। আবার বৈশাখ ঘুরিয়া আসিল। তখন আমি মৈমনসিংহে ছিলাম। তিনি মাসের ছুটি লইয়াছি। মৈমনসিংহে সেবারে আমরা একটা সারস্বত সম্মিলনের আয়োজন করি। আমি ললিতকে নিমন্ত্রণ করিয়া পাঠাইলাম। সম্মিলনের পরে কলিকাতায় যাইয়া তার বাড়ীতে কিছুকাল থাকিব, লিখিলাম। ললিত মৈমনসিং আসিল। পাঁচ সাত দিন আমার বাড়ীতেই ছিল। পরে দুই-জনে কলিকাতা যাত্রা করিলাম।

কলিকাতা পৌঁছিয়া দেখিলাম, কল্যাণী বাড়ী নাই। ললিতের চাকর আসিয়া বলিল—পূর্ব্বদিন সন্ধ্যাবেলা কল্যাণী বিছানাপত্র লইয়া কোথায় গিয়াছেন, সে সঙ্গে যাইতে চাহিয়াছিল, সঙ্গে নেন নাই। এই বলিয়া সে ললিতের হাতে একখানা চিঠি দিল। নিজে পড়িয়া ললিত চিঠিখানা আমার হাতে দিয়া, মাথায় হাত দিয়া বসিল। কল্যাণী লিখিয়াছে—

“প্রাণপ্রতিমেষু,

আমার এ চিঠি যখন তোমার হাতে পড়িবে, তখন আমি

অনেক দূরে, কত দূরে তুমি কল্পনা করিতে পারিবে না। তোমার অত্যন্ত ক্লেশ হইবে, জানি। আমারও যে ক্লেশ কম হইতেছে, ইহা ভাবিও না। কিন্তু আমার চলিয়া যাওয়া ভিন্ন আর উপায় নাই। অনেক দিন ধরিয়া এটাকে এড়াইতে অনেক চেষ্টা করিয়াছি, এড়াইতে পারিলাম না। কোথায় যাইতেছি বলিলাম না, মা বাবাও জানেন না। কেন যাইতেছি, তোমাকে বলিতে পারি না, তাঁদেরও পারিব না। তোমাদের সকলের পায়ে ধরিয়া বলিতেছি, আমার খোঁজ করিও না, করিলেও পাইবে না। তোমারই—কল্যাণী।"

দু'জনে রাধামাধব বাবুর বাড়ী গেলাম। রাধামাধব বাবুকেও কল্যাণী একখানা চিঠি লিখিয়াছে। অল্পক্ষণ পূর্ব্বেই সেখানা ডাকে আসিয়াছে। রাধামাধব বাবু চিঠিখানা হাতে লইয়াই বসিয়াছিলেন। আমাদের দেখিয়া তিনি ললিতের হাতে চিঠিখানা দিলেন। কল্যাণী বাবাকে লিখিয়াছে—

বাবা, আমি বাড়ী ছাড়িয়া চলিলাম। কোথায় যাইতেছি বলিতে পারিব না। কি হইবে ভগবান্ জানেন। মা'র প্রাণে খুব লাগিবে, জানি। কিন্তু আমার আর উপায়ান্তর ছিল না। আমার জীবন আর আমার নয়। স্বপ্নে কোনও দিন ভাবি নাই, তোমাদের এমন কষ্ট দিব। সকলই বিধাতার ইচ্ছা।

তোমরা আমার ভক্তিপ্রণাম লইবে। ঠাকুরমাকে আমার ভক্তি-প্রণাম জানাইও। সেবিকাধম সেবিকা—কল্যাণী।"

আমরা আসিবার পূর্ব্বেই কল্যাণীর মা সব শুনিয়াছিলেন। তাঁরা কিছুতেই এ রহস্য ভেদ করিতে পারিলেন না। ললিতের চিঠিখানাও দেখিলেন, তাহাতেও বিষয়টার কোনও কূলকিনারা হইল না।

আমি ছুটীর অধিকাংশটাই কলিকাতায় কাটাইব মনে করিয়াছিলাম। ললিতের অবস্থা দেখিয়া সে সংকল্প আরও দৃঢ় হইয়াছিল। ললিতের বাড়ীর পাশেই একটা বাড়ী ঠিক করিয়া, আমার ছেলে-পিলেদের আসিতে লিখিলাম। কিন্তু তাহাতে বাধা পড়িল। তিন দিন পরে, গৃহিণীর জ্বরাতিসার হইয়াছে, তারে খবর পাইলাম। আমাকে তখনি মৈমনসিং ফিরিতে হইল।

৬

পারিবারিক অসুখ ও অস্বোয়াস্তির ভিতরে মাসেক কাল আমি ললিতের কোনও খবর লইতে পারি নাই। তারপর যখন তাহার খবর লইলাম, তখন সে আমার কোনও প্রশ্নের উত্তর দিল না। কেবল লিখিল,—তুমি যার খবর জানিতে চাহিয়াছ, তার কোনও খবর লই নাই, পাই নাই, লইবও না,

পাইতেও চাই না। পোষ্টকার্ডখানা পড়িয়া বড় উদ্বিগ্ন হইলাম। বুঝিলাম ললিত একটা কিছু সিদ্ধান্ত করিয়া বসিয়া আছে। তাহা কি, পরে শুনিয়াছি।

আমি চলিয়া আসিলে ললিত প্রথমে তন্ন তন্ন করিয়া কল্যাণীর বাক্স, আলমারী, দেরাজ প্রভৃতি তল্লাস করিয়া দেখে; কিন্তু তাহাতে কোনও ফল হইল না। তারপর হঠাৎ, তার শোবার ঘরের কোণে একখানা চিঠি কুড়াইয়া পাইল। গ্রাম-সম্পর্কে রাধামাধব বাবুর একটী ভাগিনেয় ছিল। সে প্রথমে আমাদের কলেজেই পড়িত। আমি যখন এম, এ, দেই, তখন সে এফ্, এ, পড়ে। তারপর মেডিকেল কালেজে যায়। এক সময় মনে হইয়াছিল বুঝিবা তারই সঙ্গে কল্যাণীর বিবাহ হইবে। ললিত সে কথা জানিত। কল্যাণীর বিবাহের পরে সে একদিন মাত্র কল্যাণীকে দেখিতে আইসে। কিন্তু কল্যাণী সর্ব্বদাই তার কথা কহিত, আর সে কেন যে তাকে দেখিতে আসে না, এজন্য দুঃখ করিত। চিঠিখানা তারই লেখা। সে ডাক্তারি পাশ করিয়াছে, সরকারী কর্ম্ম পাইয়াছে, শীঘ্রই বর্ম্মায় চলিয়া যাইবে। বর্ম্মা তখনও ভাল করিয়া ইংরেজের দখলে আসে নাই। হাঁমে-সাই মারামারি কাটাকাটি চলিতেছিল। সেখানে ইংরাজের কর্ম্মচারীদের অবস্থা বড় নিরাপদ ছিল না। তাই সে লিখিয়াছে, তোমার সঙ্গে এ জীবনে আর কখনও দেখা হইবে কি না, জানি

না। কিন্তু যতদিন বাঁচিব, যেখানেই থাকি, তোমাদের ভালবাসা ভুলিতে পারিব না। সে বিজন বিদেশের মর্ম্মান্তিক একাকিত্বের মধ্যে তোমাদের স্মৃতি আমার একমাত্র সঙ্গী হইয়া থাকিবে। এই চিঠিখানা পড়িয়া ললিত ভাবিল, সব বোঝা গিয়াছে। বাড়ীর চাকরবাকরদের জিজ্ঞাসা করিয়া জানিল, আবার দিন দুই আগে একটী বাবু সারাদিন কল্যাণীর সঙ্গে কাটাইয়া গিয়াছেন। বর্ম্মার জাহাজের সন্ধান লইয়া জানিল, যে রাত্রিতে কল্যাণী চলিয়া যায় সেই রাত্রেই বর্ম্মার জাহাজও কলিকাতা হইতে গিয়াছিল। ললিত তারপর আর কল্যাণীর কোনও খোঁজ করিল না। মুখেও আর তার নাম লইত না।

গৃহিণীকে লইয়া যমের সঙ্গে টানাটানি করিতেই আমার ছুটী ফুরাইয়া গেল। তাঁর হাওয়া বদলান আবশ্যক। আবার ছুটি চাহিলাম, কিন্তু পাইলাম না। ললিতের সঙ্গে দেখা করিবার বা কল্যাণীর খোঁজ লইবার আর সুযোগ জুটিল না। তারপর বড়দিনের ছুটীতে কলিকাতায় গেলাম। গিয়া দেখিলাম রাধামাধব বাবু পেন্‌শন্ লইয়া কাশী চলিয়া গিয়াছেন। আর বন্ধুবান্ধবেরা বলিলেন—ললিত গোল্লায় গিয়াছে।

শুনিয়া বড় একটা বিস্মিত হইলাম না। ললিতের হৃদয়টা যে বেশী দিন নিরাশ্রয় হইয়া থাকিবে, এ কল্পনা আমি করি নাই। সে প্রকৃতি তার নয়। ললিতের পিতা চারিবার বিবাহ

করেন, ললিত তাঁর চতুর্থ পক্ষের সন্তান। ভেরেণ্ডা গাছে যেদিন তেঁতুল ফলিবে, সেদিন ললিতের রক্তে ব্রহ্মচর্য্য ফুটিতে পারে, তার আগে নয়। কল্যাণীকে হারাইয়া, ললিত প্রথমে প্রথমে মনে মনে বিবিধ রসমূর্ত্তির স্বষ্টি করিয়া তাহারই মধ্যে নিরাশ্রয় প্রাণের আশ্রয় খুঁজিতে লাগিল। এ আশ্রয় জাস্ মিলিল। অল্পদিন মধ্যেই সে একখানা উৎকৃষ্ট উপন্যাস রচনা করিল। উপন্যাসখানিতে সাহিত্যজগতে একটা প্রবল আন্দোলন জাগাইয়া তুলিল। ললিত বেনামী করিয়া বইখানা ছাপাইল। আমি মৈমনসিং'এ থাকিয়াই বইখানি পড়িয়াছিলাম। বাঙ্গালা সাহিত্যে এই গ্রন্থ এক নূতন যুগ আনিয়াছে, সকলেই বলিতে লাগিল, আমারও তাহাই মনে হইল। ক্রমে থিয়েটারের কর্ত্তারা বইখানি অভিনয় করিতে চাহিলেন। ললিত নিজেই তাহা নাটকাকারে পরিণত করিল। নাটকখানি তাদের খুব পছন্দ হইল। ললিত তখন লিখিল—এ'খানির অভিনয় করিতে হইলে রিহিয়ার্শেলটা তার মনোমত করিতে হইবে। সে যেরূপ চায়, সেইরূপ অভিনয়ের সম্ভাবনা না থাকিলে তার নাটক খানিকে সে কোনও রঙ্গমঞ্চে উপস্থিত করিতে দিবে না। থিয়েটারের কর্ত্তৃপক্ষেরা তাহার উপরেই রিহিয়ার্শেলের ভার দিলেন। ললিত নিজেই রিহিয়ার্শেল করাইতে লাগিল। বন্ধু-বান্ধবেরা বলিলেন —ঐ পথেই সে গোল্লায় গিয়াছে।

৭

কিন্তু ললিতের সঙ্গে একটিবার দেখা না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। দু'তিন দিন তার বাড়ী গেলাম,—সকালে গেলাম, দুপোরে গেলাম, সন্ধ্যায় গেলাম, রাত্রে গেলাম—দেখা হইল না। বেহারা বলিল, কখন আসে কখন যায়, ঠিকানা নাই। তারপর থিয়েটারে গেলাম। প্রথম দিন সে সেখানে আছে, শুনিলাম; কিন্তু দেখা পাইলাম না। পরের দিন থিয়েটার ভাঙ্গা পর্য্যন্ত বসিয়া রহিলাম। তারপর দেখিলাম ললিত একটী স্ত্রীলোকের সঙ্গে গাড়ী করিয়া চলিয়া গেল। আমার ছুটীর আর দু'দিন মাত্র আছে, সে রাত্রে ললিতের সঙ্গে দেখা না হইলে এ যাত্রায় আর হয় না। আমিও একখানা গাড়ী লইয়া তার পশ্চাতে পশ্চাতে ছুটিলাম। অবিলম্বেই আমার গাড়ীও সেই বাড়ীর দরজায় যাইয়া দাঁড়াইল। ললিত ও সেই স্ত্রীলোকটী সবে গাড়ী হইতে নামিয়াছে। আমিও গাড়ী হইতে নামিয়া তাদের পিছনে পিছনে বাড়ী ঢুকিলাম। ললিত স্ত্রীলোকটীর পশ্চাতে যাইতেছিল, দুতালার সিঁড়িতে উঠিবার জন্য যেই সে পা বাড়াইয়াছে, এমন সময় আমি তার কাঁধে হাত দিয়া বলিলাম—ললিত!

ললিত চমকিয়া উঠিল, ফিরিয়া নির্ব্বাক্ নিস্পন্দ হইয়া

দাঁড়াইল। স্ত্রীলোকটীও মুখ ফিরাইয়া দাঁড়াইল। আমি বলিলাম—"আমায় চিন্‌তে পার্‌ছ না? এই পাঁচদিন তোমাকে খুঁজে খুঁজে হায়রাণ্ হয়েছি। আমার ছুটী ফুরাইয়াছে, কালই চলিয়া যাইতে হইবে। কিন্তু তোমার সঙ্গে দেখা না করে যেতে পারি না। তাই এখানে এসে এ বেয়াদবি কর্‌লাম।"

স্ত্রীলোকটী বলিল—"আপনারা উপরে আসুন, সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে কেন? ললিত নিঃশব্দে উপরে উঠিতে লাগিল, আমিও তার পশ্চাৎ পশ্চাৎ উপরে উঠিলাম। স্ত্রীলোকটি সিঁড়ির পাশের একটা ঘরের দরজা ঠেলিয়া, আমাদিগকে সেখানে বসিতে বলিল। ঘরে ঢুকিয়া দেখিলাম, তাতে যেন একটা সংযমের ও ভদ্রতার হাওয়া বহিতেছে। আস্‌বাব্‌গুলি সামান্য মূল্যের, কিন্তু বড় নিপুণতাসহকারে সাজান। আমি একখানা কৌচে বসিলাম, ললিত আমার পাশেই বসিল। আমি কি বলিব, ঠিক করিতে পারিলাম না। শেষটা কেবল কথা না কহিলে নয় বলিয়া, জিজ্ঞাসা করিলাম, "ভাল আছ ত?" ললিত বলিল, "আছি।"

আবার কথা বন্ধ। এবারে আমার সুবুদ্ধি জুটিল। বলিলাম, "সুরমা বইখানা যে তোমার তা' এই সেদিন শুনেছি। আগেই পড়েছিলাম। বঙ্কিমচন্দ্রের পরে অমন উপন্যাস বাঙ্গালায় আর হয় নাই। কোনও কোনও দিক্ দিয়া মনে হয় বঙ্কিম-

চন্দ্রের উপন্যাস যা কর্‌তে পারেনি, তুমি এখানে তাই করেছ। তোমার চরিত্রগুলি কল্পিত বলে আদৌ বোধ হয় না। দিনরাত যাদের সঙ্গে ঘরকন্না করি, তারাই যেন তোমার বইএর ভিতর চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়ায়। আর নাটকখানাও অতি চমৎকার হয়েছে। আজ অভিনয় দেখ্‌লাম। অমন অভিনয় এদেশে হতে পারে, আমার ধারণা ছিল না।” ললিতের মুখের বাঁধন খুলিয়া গেল। কি করিয়া প্রথমে উপন্যাসটী লিখিয়াছিল, এই খানি লিখিতে গিয়া তার ভিতরে কি যুগান্তর উপস্থিত হয়, তারপর কি করিয়া এখানিকে নাটকাকারে পরিণত করে, সব বলিতে লাগিল। তারপর অভিনয়ের কথা বলিতে যাইয়া, আর বলিতে পারিল না। কি যেন বুকের ভিতর হইতে তার মুখের কথা বন্ধ করিয়া দিল।

আমি বলিলাম—“ইনিই না তোমার নাটকের নায়িকা সাজেন? এরই নাম কি রসমঞ্জরী? বাঙ্গালা রঙ্গমঞ্চে এমন করিয়া কেউ কখনও কোন চরিত্রকে ফুটাইয়াছে বলিয়া মনে হয় না।”

ললিত বলিল—“এখন ইহাকে দেখিলে এ কথা তোমার বিশ্বাস হ’বে না। অমন সামান্য স্ত্রীলোকের ভিতর অমন অসামান্য অদ্ভুত শক্তি ও প্রতিভা কোথাও দেখি নাই, থাকৃতে পারে বলিয়াও আগে কল্পনা কর্‌তে পারতাম না। দেখা কর্‌বে?”

আমি বলিতে যাইতেছিলাম, "এখন থাক্ ;" কিন্তু মুখ হইতে বাহির হইয়া পড়িল—"দেখ্‌তে ইচ্ছা হয় বটে।"

ললিত তাঁহাকে ডাকিয়া আনিল। দেখিলাম সত্যই এ মানুষ সে মানুষ নয়। সে তেজ, সে দীপ্তি, সে কিছুই নাই। সেখানে একটা বিশ্বগ্রাসিনী, বিশ্ববিজয়িনী শক্তির প্রকাশ দেখিয়াছিলাম, এখানে দেখিলাম অনুপম কোমল-প্রকৃতির একটি শ্রীমতী বাঙ্গালীর মেয়ে। কিন্তু একটী বস্তু সেখানে ঐ রঙ্গমঞ্চে ছিল, এখানে এই ঘরের মাঝেও আছে, তাহা চরিত্রের অসাধারণ বৈশিষ্ট্য। এই বস্তুটিকেই ইংরাজিতে Character বলে। দেখিলাম মুখের ভিতরে এমন একটা কিছু ফুটিয়া আছে যাহা আপনা হইতে চিত্তে সম্ভ্রম জাগাইয়া দেয়। দেখিয়া বন্ধুদের কথা মনে পড়িল—"ললিত গোল্লায় গিয়াছে।"

রূপ আছে, ইহা অস্বীকার করিতে পারিলাম না। কিন্তু যে ব্যক্তি যে রাজ্যের লোক এ রূপ সে রাজ্যের নহে। এ রূপ দেহগঠনের পারিপাট্যে ফুটিয়া উঠে নাই, কিন্তু স্বাস্থ্যের আভায় উদ্ভাসিত। ইহার কান্তি লাবণ্যের। ইহার মধ্যে অপূর্ব স্নিগ্ধতা আছে, জ্বালা নাই। এ রূপ আত্মসম্ভাবিত নহে, ইহাতে আত্মবিস্মৃতি আছে। দেখিয়া বিস্মিত হইলাম। যত দেখিতে লাগিলাম, ততই কাণে বন্ধুদের কথা বাজিতে লাগিল—ললিত গোল্লায় গিয়াছে।

কি কথা কহিব, খুঁজিয়া পাইলাম না। অভিনয়ের কথাটাই তুলিলাম, কথা খুলিল না। মনে হইল এ যেন কলাজগতের কোন কিছুই জানে না। ভাবিলাম এ মানুষের ভিতরে কি দুটা ব্যক্তিত্ব আছে? এরই নাম কি—Dual personality?

তার মুখে দু'চারিটী কথার বেশী শুনিতে পাইলাম না কিন্তু এ দুচারিটী কথাতেই বুঝিলাম, এ সামান্য স্ত্রীলোক নয়। জাত, কুল, ব্যবসা তার যাই হউক না কেন, দেবতা ইহার মধ্যে এখনও সজাগ আছেন। উঠিবার সময় সে আমাকে অতিশয় নত হইয়া নমস্কার করিলে বটে, কিন্তু আমি তাহাকে মনে মনে প্রণাম করিলাম।

আমি ললিতকে গোল্লায় হইতে টানিয়া তুলিতে আসিয়াছিলাম, এই রমণী আমার সে শক্তি হরণ করিল।

৮

ললিতের সঙ্গে তার বাড়ীতেই ফিরিয়া গেলাম। গাড়ীতে দু'জনার কাহারও মুখেই কোনও কথা ফুটিল না। সেই নীরবতা লইয়াই দুজনায় ললিতের শোবার ঘরে যাইয়া একখানা কৌচে বসিলাম। হঠাৎ আমি বলিয়া উঠিলাম—তার পর!—কি ভাবিয়া, কোন্ স্বপ্নঘোরে যে বলিলাম মনে নাই। কিসের পর, কি জানিতে চাহিয়াছিলাম, বস্তুতঃ পূর্ব্বাপর কিছুই ছিল কি না,

তাহাও জানি না। কেবল ঐ প্রথম কথাটাই এখনও মনে আছে।

ললিত আগে কড়ির দিকে নির্ণিমেষ দৃষ্টিতে চাহিয়াছিল, এবারে মাথা হেঁট করিয়া আনত চক্ষু দুটী মেজের উপরে রাখিল। ডান হাতের তর্জ্জনীতে কোঁচার খুঁট জড়াইতে জড়াইতে বলিল—আমি ইহাকে বিবাহ করিতে চাই, কিন্তু সে কিছুতেই রাজি হয় না।

আমার আপাদমস্তক শিহরিয়া উঠিল। অজ্ঞাতসারে মুখে কল্যাণীর নাম বাহির হইয়া পড়িল।

ললিত বলিল—"মানুষকে ভূতপ্রেতে পাইলে দেবতার নামেই শান্তি স্বস্ত্যয়ন করে।"

আমার মুখে কথা সরিল না। খানিক পরে ললিত আমার মুখের দিকে চোখ তুলিয়া কহিল—"তুমি যে বড় আমায় দেখ্‌তে এলে? এ সংসারে কেহই ত আমার খোঁজ করে না।"

বহু বহু দিন যা করি নাই, আজ তাহাই করিলাম—ললিতকে টানিয়া বুকের ভিতরে জড়াইয়া ধরিলাম। চোখ বুজিয়া আসিল। সেই নিমীলিতনেত্রে কল্যাণীর ছবি আপনা হইতে ফুটিয়া উঠিল। ললিত আমার বুকে মাথা গুঁজিয়া শীতার্ত্ত বালকের মতন কাঁপিতে লাগিল। কতক্ষণ যে দু'জনায় এ ভাবে ছিলাম, জানি না। তারপর ললিত সোজা হইয়া উঠিয়া বসিল, বলিল—

"তোমায় পেয়েছি ভালই হয়েছে। তোমার সাম্‌নে আজ হিসাব নিকাষ কর্‌ব।"

বলিয়াই উঠিয়া তার বসিবার ঘরে গেল। সেখান হইতে একতাড়া চিঠি হাতে লইয়া আসিয়া আমার কাছে বসিল। চিঠির তাড়াটা খুলিতে খুলিতে বলিল—

"তুমি আমার কথা সবই জান। একরূপ বাল্যকাল হইতেই জান। তারপরও সব জান। সে কথা তুলিব না। তুমি সেবারে আমাকে কি অবস্থায় দেখিয়া গিয়াছিলে, তাও জান। তারপর—"

ললিতের কথা আট্‌কাইয়া গেল। একটু পরে ক্ষীণ স্বরে বলিল—"জানিলাম সে বর্ম্মায় চলিয়া গিয়াছে।"

আমি উত্তেজিত হইয়া বলিলাম—"কি?"

ললিত আমার হাতে একখানা চিঠি দিয়া বলিল—"এই দেখ, তুমি চলিয়া গেলে, এখানা শোবার ঘরের কোণে কুড়াইয়া পাইয়াছি।"

আমি চিঠিখানা পড়িয়া বলিলাম—"তুমি পাগল।"

ললিত বলিল—"পাগল হই আর ছাগল হই, আমার জীবনের সে অঙ্ক শেষ হইয়া গিয়াছে। তার স্মৃতি প্রেতিনীর মতন আমাকে তিন মাস কাল দিন রাত তাড়া করিয়া বেড়াইয়াছিল। ক্রমে সুরমার স্বপ্ন রচনা করিতে যাইয়া, সে জ্বালা কমিয়া

কমিয়া গেল। কিন্তু দুধের সাধ কি জলে মিটে? না, স্বপ্নে পাঁচ তরকারী দিয়া পেট ভরিয়া খাইলে জাগ্রতের ক্ষুধার যাতনা নষ্ট হয়? প্রাণের শূন্যতা গেল না। যতক্ষণ ভাব্‌তাম ও লিখ্‌তাম ততক্ষণ বেশ থাক্‌তাম, তারপর—তারপর তুমি ত সবই দেখ্‌লে। যা ভাব্‌তে ইচ্ছা হয়, তাই ভাব। আমার কোনও ভয় ভাবনা নাই।"

খানিক পরে বলিল—আমি বিবাহ করিতে চাহিয়াছিলাম, এখনও চাই; কিন্তু সে যে কিছুতেই রাজি হয় না।

আমি বলিলাম,—না হইবারই কথা।

ললিত একটু গরম হইয়া বলিল—তুমি তাকে জান না বলেই অমন কথা বল্‌ছ।

আমি বলিলাম—যা দেখেছি ও জেনেছি তাতেই একথা বল্‌ছি।

ললিত বলিল—তুমি কি মনে কর যে ও রাজ্যে কখনও কোন ভাল লোক থাক্‌তে পারে না?

আমি বলিলাম—ভাল মন্দের বিচার করিবার আমি কে?

ললিত বলিল—তুমি বিশ্বাস কর্‌বে না, ওকে না দেখ্‌লে আর ওর সকল কথা ভাল করে না জান্‌লে আমিও বিশ্বাস কর্‌তে পার্‌তাম না। এ ভদ্রলোকের মেয়ে—

আমি বলিলাম—তা বিশ্বাস করার বাধা কি? অনেকেই ত তাই।

ললিত বলিল—সে ভাবে নয়। সে অর্থে ভদ্রঘরে তার জন্ম হয় নাই। কিন্তু কুল মন্দ হইলেও, রক্তটা ভাল। আর কেবল আর্টের আকর্ষণেই থিয়েটারে ঢুকিয়াছে, নতুবা জীবিকার ব্যবস্থা বেশই ছিল। মা মরিয়া গেলে, কথা কইবার লোক ছিল না। তখন দুই পথ তার সম্মুখে খোলা ছিল। এক, যে পথে সবাই যায়, আর যে পথ সে ধরিয়াছে। তুমি শুনিয়া আশ্চর্য্য হইবে, থিয়েটারের আলাপ পরিচয়টা তার থিয়েটারের চতুঃসীমানার ভিতরেই আবদ্ধ। আমিই প্রথম এ লক্ষ্মণের গণ্ডী পার হইবার অধিকার পাইয়াছি। আর এইটুকু না পাইলে, আজ আমি কোথায় যাইতাম জানি না।

খানিক চুপ করিয়া থাকিয়া ললিত আবার বলিল—ও যে কিছুতেই বিয়ে করতে রাজি হয় না, না হইলে আমার আর কোনও দুঃখ থাকিত না। আর যে ভাবে আমার বিবাহের প্রস্তাব অগ্রাহ্য করিয়াছে, তার উপরে আমার কোনও কথাও যে চলে না।

ললিত নীরবে হাতের চিঠির তাড়া হইতে একখানি চিঠি বাহির করিয়া, পড়িতে লাগিল। চিঠিখানা বড় নয়, কিন্তু ললিতের পড়া যেন শেষ হইতে চাহে না। অনেকক্ষণ পরে

অতি মৃদুভাবে সেখানা আমার হাতে দিল। বোধ হইল আমার হাতে দিতে যেন তার প্রাণে কি একটা ভয় জাগিতেছে। আমি পড়িলাম—

"সুহৃদ্বরেষু,—

তোমাকে এই আমি প্রথম পত্র লিখিতে বসিলাম। বাবার মৃত্যুর পরে, একবার কেবল যে থিয়েটারে আমি এখন আছি তার অধ্যক্ষ মহাশয়কে একখানা চিঠি লিখিয়াছিলাম, আর জন্মে কাউকে লিখি নাই। মুখে আমার কথা ভাল ফোটে না, তুমি জান। মুখে সকল কথা তোমাকে বুঝাইতে পারিব না, ভয় হয়। তাই লিখিতে বসিলাম। আমার পূর্ব্ব-জীবনের কথা কেউ বড় জানে না, তোমাকেও এতদিন সে কথা বলি নাই। যে সমাজ হইতে বাঙ্গালা রঙ্গালয়ের অধিকাংশ অভিনেত্রী আসিয়া থাকেন, আমি ঠিক সেই সমাজে জন্মি নাই। আমার পিতৃকুল ও মাতৃকুল উভয়ই এদেশের শ্রেষ্ঠ কুলীন-সমাজ-ভুক্ত ছিলেন। মা বাল-বিধবা ছিলেন। বাবা বিদ্যাসাগরের মতে বিবাহ করিতে পারিতেন, কিন্তু করেন নাই। ব্রাহ্ম-মতেও বিবাহ করিতে পারিতেন, কিন্তু প্রথম যৌবনে তাঁর ঈশ্বরে বিশ্বাস ছিল না; সে জন্য ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গেও একেবারে মিশিয়া গেলেন না। বাবা সর্ব্বদাই হিন্দু-সমাজে চলিতেন, কিন্তু আমরা সমাজের বাহিরে রহিয়া গেলাম। বাবা খুব বড় ডাক্তার

ছিলেন, বিস্তর উপার্জ্জন করিতেন ; আর ততোধিক খরচও করিতেন। সমাজে তাঁর প্রচুর প্রতিপত্তি ছিল। তিনি খুব ভাল ইংরাজিও জানিতেন। সে-কালে বাঙ্গালীদের মত কেউ নাকি তাঁর মতন অত ভাল শেক্ষপীয়ার জানিত না। বাবার কাছেই আমি ইংরাজি শিখি। বার তের বছর বয়সে শেক্ষপীয়ারের নাটকগুলি আমার কণ্ঠস্থ হইয়া গিয়াছিল। বাবা আমাকে দাঁড় করাইয়া শেক্ষপীয়ারের ভাল ভাল অংশগুলি আবৃত্তি করাইতেন। কলিকাতায় যখন যে ইংরাজ থিয়েটারে শেক্ষপীয়ারের অভিনয় হইত, বাবা আমাকে সেখানে লইয়া যাইতেন। শেক্ষপীয়ারের নায়িকাদের সম্বন্ধে একখানা ভাল ইংরাজি বই আছে। বইখানা সচিত্র, তুমি নিশ্চয়ই দেখিয়া থাকিবে। বড় বড় বিলাতী অভিনেত্রীগণ কি বেশে, কি ভাবে, কোন্ চরিত্রের অভিনয় করিয়াছেন, তার চিত্রগুলি আমি সর্ব্বদা নিবিষ্ট-চিত্তে অধ্যয়ন করিতাম। বাবা কখন কখন ঐ রকম সাজ তৈয়ার করাইয়া, আমাকে সাজাইয়া, সে সকল চরিত্রের ঘরাণা অভিনয় দেখিতেন।

বাবা আমাদের বাড়ীতে থাকিতেন না। আমার ঠাকুরমা তখন বাঁচিয়াছিলেন। তাঁর প্রতি বাবার অগাধ ভক্তি ছিল। বাবা ঠাকুর দেবতা মানিতেন না ; পূজা-অর্চ্চা করিতেন না। জাত-টাত মানিতেন না। অর্দ্ধেক দিন গলার পৈতা কোথায়

থাকিত, ঠিকানা নাই। কিন্তু প্রতিদিন প্রত্যূষে উঠিয়া মার পায়ের ধূলি না লইয়া কোনও বিষয়-কর্ম্ম করিতেন না; আর যত রাত্রিই হউক না কেন, মাকে প্রণাম না করিয়া শুইতে যাইতেন না। তিনি ঈশ্বর মানিতেন না, কিন্তু মাকে ঈশ্বরের মতন ভক্তি করিতেন। মার মনে বড় লাগিবে বলিয়াই তিনি প্রকাশ্যভাবে সমাজ ছাড়েন নাই। ঠাকুরমার যখন গঙ্গালাভ হইল, তার পূর্ব্বেই আমি জন্মিয়াছি। মার জীবদ্দশায় বাবা আমাদিগকে নিজের বাড়ীতে নিতে পারেন নাই, মার মৃত্যুর পরেও নিলেন না। আমরা যেরূপ ছিলাম সেই ভাবেই রহিয়া গেলাম।

আমরা ভদ্রপল্লীর মাঝ-খানে, অতি সম্ভ্রান্ত ভাবেই বাস করিতাম। তথাপি আমাদের অবস্থাটা গোপন রহিল না। ক্রমে আমি বড় হইয়া উঠিলাম। ইংরাজি মাষ্টারের কাছে নিয়মিত মত সাধারণ ইংরাজি শিক্ষা করিতে লাগিলাম। বৃদ্ধ পণ্ডিতের নিকটে সংস্কৃত শিখিতে আরম্ভ করিলাম। একজন ওস্তাদ গান-বাজানা শিখাইতে লাগিল। ব্রাহ্মসমাজে এসব চলিয়া গিয়াছে, হিন্দু সমাজে তখনও চলে নাই। পাড়ার লোক প্রথমে কটাক্ষ করিতে লাগিল। ক্রমে ঠাট্টা তামাসা আরম্ভ করিল। শেষে একদল বদমায়েস ছোক্‌রা পেছনে লাগিল। প্রথম প্রথম ডাকে বেনামি চিঠি দিতে আরম্ভ করিল। তার পর ঢিলে জড়াইয়া সে সব কদর্য্য-

চিঠি বাড়ীর ছাতে ফেলিতে আরম্ভ করিল। আমার ছাতে ওঠা বন্ধ হইল। গান বাজানা বন্ধ হইল। স্কুলে যাওয়া বন্ধ হইল। ঘরের মধ্যে বন্দিনীর মতন বাস করিতে লাগিলাম। তাতেও শান্তি পাইলাম না। একদিন সন্ধ্যার পরে দুটি লোক ছাত ডিঙ্গাইয়া আমাদের ছাতে পড়িয়া বাড়ী ঢুকিল। আমি তখন দোতালায়, আমার শোবার ঘরে, একেলা বসিয়া পড়িতেছিলাম, মা নীচে ছিলেন। বেহারা বাহিরে গিয়াছে। দরওয়ান বাড়ী নাই। ঝিও বাড়ী ছিল না। আমার দরজার সামনে আসিয়া তারা দাঁড়াইল। আমি তাদের দেখিয়া চীৎকার করিয়া উঠিলাম। তারা আমার ঘরে আসিয়া আমার মুখ চাপিয়া ধরিতে গেল। এমন সময় মা দৌড়িয়া আসিলেন, মাকে দেখিয়া তারা আমার নিকট হইতে সরিয়া দাঁড়াইল। মা তাদের বেয়াদবীর প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করিয়া, তাদের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। তাদের একজন পাড়ারই এক বড় জমিদারের ছেলে। মা তাদের অন্য ঘরে ডাকিয়া লইয়া গিয়া বসিতে বলিলেন। মার ভাব দেখিয়া তারা ভুলিয়া গেল। তার পর মাকে তারা যে সকল কথা বলিল, তাহা তোমাকেও বলিতে পারিব না। মা সব চুপ করিয়া শুনিতে লাগিলেন। ক্রমে তারা দর বাড়াইতে লাগিল, মা তবুও কথা কহিলেন না। শেষে বলিল, আমাকে বাড়ী করিয়া দিবে, রাজরাণী করিয়া রাখিবে, হীরামতি দিয়া মুড়িয়া দিবে, তার চিহ্ন

জন্মের মতন মার বাঁধা বৃত্তির বন্দোবস্ত করিয়া দিবে। তখন বাবার পায়ের শব্দ শোনা গেল। মা অমনি "তবে রে, হারামজাদা!" বলিয়া সিংহিনীর মতন গর্জ্জন করিয়া উঠিলেন। তাঁর সে মূর্ত্তি দেখিয়া দুর্বৃত্তেরা বিপদ গণিয়া ছুটিয়া ভিতর বাড়ীর শিঁড়ি দিয়া সরিয়া পড়িল।

এ ঘটনার পর আমি যে পুরুষের মুখ দেখা ত দূরের কথা গান পর্য্যন্ত গাহিতে পারিতাম না, ইহা আর আশ্চর্য্যের কথা কি? টাকা দিয়া তারা মানুষের প্রাণটা কিনিতে চায়, একথাটা সেই দিন প্রথম জানিলাম। আমার বয়স তখন চৌদ্দ পনের। জীবনের স্বপন-ঘর কেবল তৈয়ারী করিতে আরম্ভ করিয়াছি। এই দিনকার এই ঘটনায় আমার সে-ঘর ভাঙ্গিয়া চূরমার করিয়া দিল। আর সেদিন যা যা দেখিয়াছিলাম, শুনিয়াছিলাম ও বুঝিয়াছিলাম, এ পর্য্যন্ত তাহাই আমার জীবনের রক্ষা-কবচ হইয়া আছে।

পরের দিনই আমরা সেই পাড়া ছাড়িয়া পলাইলাম। বিছানা-পত্র, আসবাব, ঘরকন্নার কোনও কিছু সঙ্গে নিলাম না। কেবল মার ও আমার কাপড়-চোপড় আর আমার বইগুলি গোপনে গোপনে বাবার বাড়ীতে পাঠাইয়া দিলাম। আর সব এই বাড়ীতে পড়িয়া রহিল। আমরা রাত্রের বেলা চলিয়া গেলাম। একেবারে কলিকাতা ছাড়িয়া গেলাম। পাঁচ সাত দিন পরে, আর এক

পল্লীতে নূতন বাড়ী ভাড়া করিয়া সেখানে আসিয়া উঠিলাম। এই নূতন বাড়ীতে নূতন ঝি চাকর আসিল। মা বলিলেন, আমরা নূতন পল্লীগ্রাম হইতে আসিয়াছি। এখানে আমরা একেবারে প্রাচীন তন্ত্রের হিন্দু পরিবারের মতন বাস করিতে লাগিলাম। লোকে কথা বলিবে ভয়ে মা আমাকে লোহা ও রুলী পরাইয়া দিলেন। সিঁথিতে সিন্দূর পরিতে লাগিলাম। বাবারও নিয়মিত মত আসা বন্ধ হইল। যখন আসিতেন, বৈকালে ডাক্তারীর ছলেই যেন আসিতেন; বেশীক্ষণ থাকিতেন না। আমার লেখা পড়া বন্ধ হইল না বটে, কিন্তু গান বাজানা বন্ধ হইয়া গেল। এমন করিয়া কতকাল থাকা যায়, আমার শরীর মন দুই শুকাইয়া যাইতে লাগিল।

বাবা একদিন আমার অবস্থা দেখিয়া বলিলেন—"তোমাদের বাড়ীর গান বাজানাত বন্ধ হইয়াছে। তবে দিন কাটে কি করে? মাঝে মাঝে মা-মেয়েতে থিয়েটারে যেতে আরম্ভ কর। তাতেও মনে কতকটা ফূর্ত্তি হবে।" তখন হইতে আমি মার সঙ্গে থিয়েটারে যাইতে লাগিলাম। এর আগে বাঙ্গালা থিয়েটারে আমি আর কোনও দিন যাই নাই।

এ সব অভিনয় আমার ভাল লাগিত না। যারা বাজাইতে জানে, কেউ খারাপ বেসুরা বাজাইতেছে দেখিলে তাদের হাত ইষ্পিষ্ করে, আমার শরীর মন এ সকল অভিনয় দেখিয়া সেইরূপ

ইষ্‌পিষ্‌ করিতে লাগিল। কেবলই মনে হইতে লাগিল, আমি ওখানে ঐ ষ্টেজে বসিয়া ঐ ভূমিকাগুলি করিয়া দেখাই। ক্রমে আমি সে সকল বই আনিয়া নিজে নিজে বাড়ীতে বসিয়া তার অভিনয় করিতে লাগিলাম। বাবা শুনিয়া চারিখানা খুব বড় আয়না কিনিয়া পাঠাইয়া দিলেন। সেই আয়নাগুলা আমার ঘরের দেয়ালের চারিদিকে টাঙ্গাইয়া, তারই সাম্‌নে তখন হইতে এ সকল ভূমিকার অভিনয় করিয়া আপনা আপনি দেখিতে লাগিলাম। কখনও মা আসিয়া দেখিতেন, কোনও দিন বা সুবিধা হইলে বাবাও দেখিতেন। এইরূপে আক্টিং করার একটা নেশা চড়িয়া গেল। সপ্তাহে যে কদিন থিয়েটার হইত সেই কদিনই দেখিতে যাইতাম। আর বাকি দিন নিজে নিজে ঐ গুলির অভিনয় করিতাম।

বাবা একদিন বলিলেন—সকল বিদ্যারই একটা সাধনা আছে, আর সংযম ছাড়া কোনও সাধনাই সম্ভব হয় না। কেবল নাট্যকলারই কি কোনও সাধনা ও কোনও সংযম নাই।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—"বাবা, সে সাধনাটা কি?"

বাবা বলিলেন—"সে সাধনাকে আমাদের দেশে আগে রসতত্ত্ব বলিত। আজিকালিকার দিনে সে সাধনাটা কি, বুঝিতে হইলে প্রধানভাবে Physiology of the Emotionsটা বুঝিতে হয়। ইমোষণকেই আমাদের দেশে রস বলে। এই রসের একটা psychology আছে, আর সেই Psychologyর একটা

physiology আছে। এই দুইটী জিনিস বুঝিলে তবে নাট্যকলার সত্য সাধনাটা কি, ইহা বুঝিতে পারা যায়।” আমি বলিলাম—“বাবা আমাকে এ সাধনাটা শিখাইয়া দিতে হইবে।” বাবা মোটামুটি আমাকে জিনিষটা বুঝাইয়া দিলেন। তখন বুঝিলাম আমাদের দেশে অভিনয় এমন খারাপ হয় কেন?

ইহার কিছুকাল পরে, এক মাসের ভিতরে আগে মা ও পরে বাবা মারা গেলেন। আমি চারিদিকে অন্ধকার দেখিতে লাগিলাম। মোটামুটি খাওয়া পরার ভাবনা কিছুই ছিল না। কিন্তু দিন কাটে কিসে? আমি থিয়েটারে ঢুকিতে চাহিলাম।

যেখানে তোমার সঙ্গে আমার প্রথম সাক্ষাৎ হয়, তার অধ্যক্ষের নিকটে চিঠি লিখিলাম। তিনি আমার সঙ্গে দেখা করিতে আসিলেন। আমি বলিলাম,—“আমি অসহায় ব্রাহ্মণ কন্যা, আপনার শরণাপন্ন হইলাম।”

তিনি দাঁড়াইয়া আমাকে প্রণাম করিলেন। আমি শরীরে শিহরিয়া উঠিলাম। বলিলাম—“ব্রাহ্মণের রক্তে আমার জন্ম, কিন্তু ব্রাহ্মণের অধিকার আমার নাই। আপনি আমাকে প্রণাম করিবেন না।” তিনি বলিলেন—“ব্রাহ্মণের রক্তই আমার নমস্য—তার ভাল-মন্দের বিচারে আমার অধিকার নাই।”

আমি তাঁহাকে আমার জীবনের ইতিহাসটা বলিয়া, বলিলাম

—"আমি থিয়েটারে যাইতে চাই। জীবনে আমার অন্য কর্ম্ম ত নাই।"

তিনি বলিলেন—"কর্ম্মটাও সোজা নয়। সংসর্গও নিরাপদ নহে।"

আমি বলিলাম—"আমি কতকটা অভিনয় শিখিয়াছি।"

তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন—"কোথায়?"

আমি বলিলাম—"এই বাড়ীতে। এখানেই আমার নিজের একটা ষ্টেজ আছে।"

কথাটায় তাঁর কুতূহল বাড়িল। সে কেমন ষ্টেজ? আমি তখন আমার সেই আয়না-ঘেরা ঘরে লইয়া গেলাম। তিনি দরজায় গিয়াই থমকিয়া দাঁড়াইলেন। বাবার মৃত্যুর পরে আমি সেই ঘরেই তাঁর ছবিখানা আনিয়া সাজাইয়া রাখিয়াছিলাম। তিনি সেখানা দেখিয়া চমকিয়া উঠিলেন। বলিলেন—আর বল্‌তে হবে না, বুঝিয়াছি তুমি কে? তোমার বাবার মুখেই তোমার কথা শুনিয়াছি। তোমার বাবার সঙ্গে আমার কি সম্বন্ধ তাত তুমি জান না। তিনি আমার বয়সে বড় ভাইএর মতন ছিলেন। আমি তাঁকে বাবার মতন ভক্তি করিতাম। তিনি আমাকে ছোট ভাইএর মতন স্নেহ করিতেন। তাঁরই দৌলতে আমি মানুষ হইয়াছি। আমি বলিলাম—এই ঘরে বাবার কাছে আমি ইংরেজি বাংলা অনেক নাটকের অভিনয় করিয়াছি।

তাঁর নিকটেও দুই তিনটা চরিত্রের অভিনয় করিলাম। তিনি বলিলেন—"অভিনয় তুমি খুবই পার্ব্বে। কিন্তু ভাব্‌ছি সংসর্গের কথা।"

আমি বলিলাম—"আপনি যদি আমার বাপ হয়ে রক্ষা করেন, আমাকে কিছুতে স্পর্শ করিতে পারিবে না, আমি যে ঘরপোড়া গরু।"

তিনি বলিলেন, "তাই হউক। ঠাকুর তোমাকে রক্ষা করিবেন।"

তারপর তোমার সঙ্গে দেখা। তুমি কোন্ পথে আমার জীবনে আসিয়াছ, তাহা জান। আমার জীবনের ঐ একটী পথই বাল্যাবধি খোলা ছিল, আর পথ ছিল না, এখনও নাই। আমি জীবনে যা কিছু পাইয়াছি ঐ পথেই আসিয়াছে সেই পথেই তোমাকেও আমার জীবনের সহায় রূপে বরণ করিয়াছি, সেই পথেই তোমার জীবনের সহচরী হইয়া তোমার সেবা করিবার অধিকার লইয়াছি। অন্যপথে আমার অধিকার নাই। এই জন্যই তুমি যে প্রস্তাব করিয়াছ আমি তাহাতে কোন মতে সম্মত হইতে পারি না। তুমি আমার জীবনে আসিবার আগে, আমি অপরের রস-মূর্ত্তিকেই রঙ্গমঞ্চে ফুটাইতাম, নিজে রসমূর্ত্তির স্থষ্টি করিতে পারি নাই। তুমি আমাকে দিয়া এইটি করাইয়াছ। আমিও তোমার নিত্য নূতন রস-স্থষ্টির সাহায্য করিতে পারিলেই

কৃতার্থ হইব। তোমার সন্তানের জননী হইবার অধিকার আমার নাই। তুমি পুরুষ, আমি যে স্ত্রীলোক। পুরুষের পিতৃত্ব বুদ্বুদের মতন উপরে ভাসিয়া থাকে, রমণীর মাতৃত্ব তার হাড়ে হাড়ে ঢুকিয়া যায়। আমি বাবাকেও দেখিয়াছি, মাকেও দেখিয়াছি। আর মার কথা ভুলিতে পারি না বলিয়াই তোমার প্রস্তাবে রাজি হইতে পারি না। তুমি আমার জন্মকথা অগ্রাহ্য করিতে পার, আমি যে পারি না। আর আমি ভুলিয়া গেলেই, আমার সন্তানও কি তাহা ভুলিতে পারিবে? আমি তোমার জন্য প্রাণ দিতে পারি, কিন্তু তোমাকে সুখী করিবার জন্যও, যারা এখনও জন্মায় নাই, তাদের সম্ভ্রম ও মর্য্যাদা আগে হইতে জন্মের মতন নষ্ট করিয়া রাখিতে পারি না। আমার প্রাণের বেদনা কি তুমিও বুঝিবে না? মুখে সব কথা তোমাকে বুঝাইয়া বলিতে পারিতাম না, তাই এই দীর্ঘ পত্র লিখিলাম। এই কথা তুলিয়া আর আমাকে যাতনা দিও না।"

কতক্ষণ যে এই চিঠিখানা পড়িতে লাগিল, জানি না। পড়া শেষ হইলেও কতক্ষণ যে, এ খানিকে হাতে লইয়া বসিয়াছিলাম, তাহাও বলিতে পারি না। চিঠিখানা ললিতের হাতে ফিরাইয়া দিয়া আনমনে বলিলাম—"এখন?"

ললিত বলিল—এখন, যা দেখ্‌লে যা জান্‌লে তাই। তুমি যে আমার বাড়ী, আমাকে খোঁজ করতে এসেছিলে, তা আমি

জান্‌তাম। প্রতিদিনই আমি বাড়ী ছিলাম। তোমাকে বাড়ী ঢুক্‌তেও দেখিয়াছি। দেখা কর্‌তে ইচ্ছা হয় নাই, তাই করি নাই। আর আমার বেহারা জানে আমি কারও সঙ্গে দেখা করি না। সবাইকে এ'কথা বলে—বাবু বাড়ী নাই। তুমি ত জানই, আমার বন্ধুবান্ধবেরা সবাই বলে—আমি গোল্লায় গিয়াছি। সত্যি করে বল দেখি, তুমিও কি তাই ভাব ?

কি উত্তর দিব ভাবিয়া আকুল হইলাম। বিধাতা বাঁচাইলেন। চাকর চা লইয়া আসিয়া, দরজা জানালা খুলিয়া দিল। সূর্য্য উঠিয়াছে। ললিত বলিল—তাই ত, সারা রাত তোমায় ঘুমুতে দেই নাই।

৯

এই বৎসর পূজার সময় আবার এক মাসের ছুটি লইলাম। রাধামাধব বাবু, কোন্ সূত্রে বলিতে পারি না, এ খবর পাইয়া একবার কাশীতে যাইয়া তাঁর সঙ্গে দেখা করিতে লিখিলেন। আমারও সেই ইচ্ছা ছিল। পরিবারবর্গকে বৈদ্যনাথে রাখিয়া আমি কাশী চলিয়া গেলাম। রাধামাধব বাবু তাঁর গুরুদেবের ঠিকানা দিয়া, সেই খানেই যাইয়া আমায় উঠিতে লিখিয়াছিলেন। আমি সেই খানেই গেলাম। আমি তাঁহাকে প্রণাম করিয়া

উঠিয়া দেখি, কল্যাণী সেখানে দাঁড়াইয়া ; কোলে নয় দশ মাসের একটী ফুট্‌ফুটে ছেলে ; মুখে যেন ললিতের মুখখানি আবার কচি হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। দেখিয়া আমি চমকিয়া উঠিলাম। কল্যাণী ছেলে কোলে লইয়াই আমাকে প্রণাম করিল। আমি বলিলাম, তোমার একি অন্যায় কাজ, মামাকে যে সোণা দিয়া ভাগিনার মুখ দেখ্‌তে হয়, আমি এখন সোণা পাই কোথায় ?

বিকালবেলা আনন্দস্বামী আমাকে নিভৃতে ডাকিয়া, কল্যাণী এই দেড় বৎসর কাল যে তাঁর কাছেই ছিল, সে কেন বাড়ী ছাড়িয়া চলিয়া আসে, কেন ললিতকে বলিয়া আইসে নাই, কেন পরেও কোন সংবাদ দেয় নাই, সকল কথা বুঝাইয়া বলিলেন। আমি বলিলাম—সবই বুঝিলাম, কিন্তু ললিতের কথা ত আপনারা ভাবিলেন না, আর কল্যাণীর ভবিষ্যতের দিকেও ত চাহিয়া দেখিলেন না।

আনন্দস্বামী একটু হাসিয়া বলিলেন—সবই ভাবিয়াছি।

আমি বলিলাম—ললিতের খবর—

আনন্দস্বামী বলিলেন—সবই রাখি, সবই জানি !

আমি বলিলাম—ললিতের জীবনটা যে নষ্ট হইল, আর কল্যাণীর সংসারও উৎসন্নে গেল।

আনন্দস্বামী বলিলেন—আপনি জ্ঞানী হইয়া অমন কথা বলিবেন ভাবি নাই। সত্য কি কাউকে নষ্ট করে ?

আমি চমকিয়া উঠিলাম। প্রাণের মর্ম্মস্থল পর্য্যন্ত যেন কথা-গুলিতে নাড়িয়া চাড়িয়া দিল। তবু বলিলাম—আপনি সত্য কাকে বলেন?

"প্রত্যেকের প্রকৃতিই তার একমাত্র সত্য।" "প্রকৃতির কি ভাল মন্দ নাই?" "প্রকৃতি যা নয়, তাই মন্দ, তা ছাড়া আর মন্দ কোথায়?" "তবে ধর্ম্মাধর্ম্ম?" "স্ব-ধর্ম্ম ভিন্ন আর ধর্ম্ম নাই। কল্যাণী আপনার ধর্ম্মের প্রেরণাতেই ললিতকে ছাড়িয়া আসে।" "বুঝিলাম না।"

"বোঝা সহজ। কল্যাণী যতদিন কেবল রমণী ছিল, ততদিন ললিতের সেবাই তার শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম ছিল, যে দিন সে মা হইতেছে বুঝিল, সে দিন এই নূতন মাতৃ-ধর্ম্ম তার পূর্ব্বকার সকল ধর্ম্মাধর্ম্মকে ছাড়াইয়া, তাহাকে এক নূতন নিয়মে বাঁধিল। এরই খাতিরে সে ললিতকে ছাড়িয়া আসিয়াছে।

"এখন?" "ছেলে বড় হইয়াছে, স্তন ছাড়িলেই কল্যাণী আবার ললিতের কাছে যাইবে।" "আপনি কল্যাণীর ধর্ম্মটাই কেবল দেখিলেন, ললিতের কথাটা ত ভাবিলেন না?"

"ভাবিয়াছি। ললিত ধর্ম্মমতে কল্যাণীকে বিবাহ করিয়াও ধর্ম্মপত্নীত্বে কোন দিন বরণ করে নাই। কামপত্নী করিয়াই রাখিতে লাগিল, ললিত রস চাহিয়াছে, ভোগ চাহিয়াছে, সখ ও সুখ চাহিয়াছে, আপনাকে বহু করিয়া আত্মার যে পরম সার্থকতা

লাভ হয়, তাহা চাহে নাই। যে যা চায়, সংসারে সে তাই পায়। ললিত যাহা চাহিয়াছিল, তাহা পাইয়াছে।”

“কল্যাণীকে সে কি আর গ্রহণ করিবে? কল্যাণীই কি আর ললিতের জীবনের আধখানা লইয়া সন্তুষ্ট থাকিতে পারিবে?”

“না পারিলে কল্যাণী এখনও মা হইবার অধিকার পায় নাই। কল্যাণীই কি আর ললিতকে তার জীবনের সবটা দিতে পারে? এই ছেলে যে তার বড় আধখানা জুড়িয়া বসিয়াছে।”

আমার বড় খটকা লাগিল। জিজ্ঞাসা করিলাম—“কল্যাণী সব জানে?”

“সব জানে। আপনি যে কলিকাতায় এসেছিলেন, তাও জানে।”

আমি অবাক্ হইয়া গেলাম। বলিলাম—“আপনাদের কোনও অতিলৌকিক শক্তি আছে, নতুবা বহুতর গুপ্তচর নিশ্চয় আছে; নহিলে এ সব কথা আপনারা জানিলেন কেমন করিয়া?”

“উত্তর বড় সহজ। মঞ্জরীর মা আমার মন্ত্রশিষ্যা ছিলেন। মঞ্জরী আজ এখানেই আছে। কল্যাণীর কথা সে বিশেষ কিছুই জানিত না। এখন সকল রহস্য ভেদ হইয়াছে, আর তার প্রাণের যে দিক্‌টা খালি ছিল, কল্যাণীর সন্তানকে বুকে ধরিয়া তাহা পূর্ণ হইতেছে।”

আমি আনন্দস্বামীর পায়ে পড়িয়া প্রণাম করিলাম। তিনি

"নমো নারায়ণায়" বলিয়া আমাকে দুই হাত দিয়া তুলিয়া লইয়া, বুকের ভিতরে জড়াইয়া ধরিলেন। তারপর কি যে হইল জানি না!

চোখ খুলিয়া দেখিলাম—কল্যাণীর পাশে, তার ছেলেটীকে কোলে লইয়া মঞ্জরী দাঁড়াইয়া। আমি চোখ খুলিবামাত্র কল্যাণীর কোলে ছেলেটীকে দিয়া সে আমাকে আসিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিল।

আনন্দস্বামী বলিলেন—বিশ্বের পরম তত্ত্ব স্বরূপতঃ এক, রূপতঃ দুই। এই দুই'এর এক পুরুষ আর এক প্রকৃতি। এই প্রকৃতির আবার দুইরূপ, একরূপ জগদম্বা আর একরূপ শ্রীরাধিকা, একরূপের আশ্রয়ে সৃষ্টির, আর অপরের আশ্রয়ে লীলার প্রকাশ হয়। এই তিনেতে পুরুষ আপনি আপনার পূর্ণতা সাধন করেন।

চাহিয়া দেখিলাম একদিকে কল্যাণী, আর একদিকে মঞ্জরী, আর মাঝখানে দুজনের হাত ধরিয়া দাঁড়াইয়া কল্যাণীর সন্তানটী।

আমি এই অভিনব বিশ্বরূপ দেখিয়া, প্রণাম করিলাম।

আনন্দস্বামীকে জিজ্ঞাসা করিলাম—এরূপ প্রকট কোথায়?

তিনি ভাবাবিষ্ট হইয়া বলিলেন—শ্রীবৃন্দাবনে।

———

বাৎসল্যের আতিশয্য

১

রূপের কথা তুলিলে, রূপ কা'কে বলে কিসে হয়, এখনও পর্য্যন্ত বুঝিলাম না। বয়স ত কম হয় নাই। দেখা শুনাও ভাগ্যে অল্প জুটে নাই। স্বদেশে বিদেশে, ভবঘুরে' হইয়াই ত এই চল্লিশ পঞ্চাশ বৎসর কাটাইলাম। আর চোখ খুলিয়াই কাটাইলাম। কাউকে ভাল লেগেছে, কাউকে একবার দেখে, আবার দেখ্‌তে সাধ গিয়াছে; কাউকে ভাল লাগে নাই, কারও মুখে চোখ পড়েও যেন পড়ে নি। কিন্তু এ-ছাড়া রূপবস্তু যে কি চিনিলাম না।

প্রথমবয়সে এক ডাকষাট রূপসীকে দেখেছিলাম। সবাই বল্‌ত, অমন রূপ হয় না। রং ছিল তার চাঁপার মত। মুখখানি ছিল যেন কুঁদা; বন্ধুরা বলিতেন, ঠিক যেন দুর্গা প্রতিমার মতন। তেমনি সরল নাসিকা; তেমনি ডাগর, টানা চক্ষু; তেমনি বাঁকা ভুরু; তেমনি লাল নাতিপুরু নাতিপাতলা দুখানি ঠোঁট। আর ঐ ঠোঁট দুখানি যখন একটু অবকাশ দিত, তখন তার মাঝখান দিয়া, সেই রক্তাভ-বিভাষিত শুভ্র দাঁতগুলি দেখাইত যেন মুকুতার পাঁতি। গড়ন ছিল তার লম্বা, ঠিক এই গড়নকেই

বুঝি পুরাতন কবিরা তন্বী বলিতেন। লোকে বলিত, অমন রূপ কবিতাপুস্তকের বাহিরে প্রায় দেখা যায় না। আমি কিন্তু তার পানে নিবিষ্ট মনে তাকাইতাম, আর ভাবিতাম কৈ, এত রূপের কথা যে লোকে বলে, সে রূপ কৈ?

এই ডাকষাট রূপসীর রূপ দেখিবারও অবসর মিলিয়াছিল আমার যথেষ্ট। সে আমাদের আত্মীয়া ছিল, দূর সম্পর্কও তার সঙ্গে ছিল। যখন প্রথম পরিচয় হয়, তখন আমার বিবাহ হইয়া গিয়াছে। সংসারে আমার বৃদ্ধা বিধবা পিতৃম্বসা ভিন্ন আর কেউ ছিল না। বউ আমার পিসিমার আপনার ভাসুর-ঝি। আমিও দেখিয়া শুনিয়া, পছন্দ করিয়াই বিবাহ করিয়াছিলাম। সুতরাং আমি কেবল নিঃসঙ্কোচে নয়, একান্ত নিঃসঙ্গভাবেই এই ডাকষাট রূপসীর রূপ পরখ করিয়া দেখিতে আসিয়াছিলাম। কিন্তু লোকে যাঁকে অমন সুন্দরী বলিত, আমি তার কোন্‌খানা যে সুন্দর খুঁজিয়া পাইতাম না।

আমি তখন ওকালতি পাশ হইয়া, তিন বৎসর মফঃস্বলে কাটাইয়া, হাইকোর্টে আসিয়াছি। তাদের পাড়াতেই আমি যাইয়া বাসা করিলাম। আমার পিসিমা তার মার বাল্যসহ-চরী ছিলেন। দুজনায় গঙ্গাজল পাতান ছিল। এই সূত্রে উভয় পরিবারে বেশ ঘনিষ্ঠতা জমিয়া গেল। আমি তখনও মাঝে মাঝে আমার বউকে পড়াইতাম। একদিন তার মা আসিয়া

দেখিলেন যে, আমি এই স্কুলমাষ্টারি করিতেছি। অমনি ধরিয়া বসিলেন, তাঁর মেয়েকেও একটু আধটু পড়াইতে হইবে। কিছু দিন পর্য্যন্ত নানা অজুহাতে এ দায় এড়াইতে চেষ্টা করিলাম। শেষে নগেন যখন ধরিয়া পড়িল, তার ভাবী পত্নীকে লেখাপড়া শিখাইয়া দিতেই হইবে, তখন কাজেই রাজী হইতে হইল।

নগেন আমার বাল্য-বন্ধু। যৌবনের প্রথম উন্মেষে বালকে বালকে যে অপূর্ব্ব সখ্য হয়, আমরা দুজনায় সেই সখ্যে বাঁধা ছিলাম। সেই নগেনও বহুদিন বাঁচিয়াছিল, সেই আমি এখনও আছি, কিন্তু সে সখ্যরস চিরদিন রহিল না। কৈশোর গেলে বুঝি রসাস্বাদের শক্তিও মানুষের কমিয়া যায়। আমরা তখন দুজনার কি যে ছিলাম, বলিতে পারি না।

আমি যেদিন বিবাহ করি, সেদিন নগেন অঝর-ঝরে কাঁদিয়াছিল। কোথা হইতে এক অজানা বালিকা আসিয়া আমাকে তার হৃদয় হইতে কাড়িয়া লইবে, এই ভাবিয়া সে অস্থির হইয়া পড়িল। এতদিন দুজনার মাঝখানে আর কেউ ছিল না। এখন আমাদের দুজনার জীবনের মাঝখানে একটা রহস্যের পর্দ্দা পড়িয়া গেল। তখন হইতে নগেনও বিবাহের জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িল। সম্বন্ধও অনেক আসিল। কিন্তু কোনটাতেই তার মন উঠিল না। নগেনের বন্ধুবান্ধবদের বিবাহ হইয়া গেল। কিন্তু নগেন অবিবাহিত রহিল। তারা তখন তাঁহাকে বেনেডিক্ট্ খেতাব দিল।

আমি কলিকাতায় আসিলে, নগেন একদিন আমাদের বাড়ী আসিয়া ইহাকে দেখিল। ক্রমে দুজনার বিবাহের কথা উঠিল। নগেন এতদিন কন্যা পছন্দ হয় নাই, বলিয়া বিবাহ করে নাই। ক্রমে বয়সের অজুহাত দিতে লাগিল। তার বয়স তখন সাতাশ, কিন্তু বলিয়া বেড়াইত ত্রিশ। আর ত্রিশ বছরের বুড়া বার বছরের বালিকাকে কেমন করিয়া বিবাহ করিবে, এই বলিয়া সকল সম্বন্ধই সে উড়াইয়া দিত। কিন্তু এ ক্ষেত্রে সে কথা খাটিল না। নলিনীর মা বলিতেন তার বয়স সবে তের; কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তার বয়স আরও বেশী হইয়াছিল। আর বয়স যাহাই হউক না কেন, দেখাইত তাহাকে ফুল্ল যুবতী। এইজন্যই বিবাহ হয় নাই। নগেনের মনোভাব বুঝিয়া, আমি পিসিমাকে বলিলাম। পিসিমাই ঘটকালী করিলেন। নগেনের অবস্থা ভাল, বংশ ভাল, নগেন বি, এ, পাশ দিয়াছে, কন্যা-পক্ষীয়েরা তাহাকে একেবারে লুফিয়া লইলেন। কিন্তু পাকা দেখার দুদিন পরেই নগেনের মা হঠাৎ মারা গেলেন। কাজেই এক বৎসর বিবাহের দেরি পড়িয়া গেল। আর এই এক বৎসর কাল নগেনের ভাবী পত্নীকে লেখাপড়া শিখাইবার ভার আমার উপরে পড়িল।

এই এক বৎসরকাল প্রায় প্রতিদিনই আমি নলিনীকে দেখিয়াছিলাম। হাইকোর্টে প্রতিদিনই যাইতাম বটে, কিন্তু মক্কেলের মুখ তখনও দেখি নাই। যাওয়া-আসাই কেবল সার

হইত। সকাল বেলা কিছু কিছু আইন পড়িতাম। আর বৈকাল-বেলা প্রতিদিনই নলিনী আমার কাছে পড়িতে আসিত; কোনও দিন বা সন্ধ্যার পূর্ব্বে, কোনও দিন বা সন্ধ্যার পরে সে চলিয়া যাইত, তারপর খাওয়া দাওয়া করিয়া গৃহিণীকে পড়াই-তাম। এইরূপে এই বৎসরকাল তার এই ডাকষাট রূপটাকে নানা ভাবে, নানা দিক্ দিয়া পরখ করিয়া দেখিবার বিস্তর সুযোগ পাইয়াছিলাম। কিন্তু কোনও দিন আমার চোখে ঐ রূপ রূপ বলিয়াই ঠেকে নাই। প্রতিদিনই সে চলিয়া গেলে এই রূপের কথা লইয়া আমাদের স্বামী-স্ত্রীতে বাদ-বিতণ্ডা হইত। তার কোনও রূপ আছে, কিছুতেই আমি ইহা মানিতাম না। আর আমাকে খেপাইবার জন্যই যেন, দুজনায় নিরালায় বসিলেই, আমার স্ত্রী প্রায় প্রতিদিনই এই রূপের অযথা প্রশংসা করিতেন। তিনি বলিতেন—"অমন সুন্দরী কেউ কোনও দিন দেখে নি। তোমার বন্ধু কি ভাগ্যবান্?" আমি বলিতাম—"এর কোন্‌খানটা যে সুন্দর, আমি ত আজ পর্য্যন্ত খুঁজিয়া পাইলাম না।" তিনি বলিতেন—"কেমন রং!" আমি বলিতাম—"পটোপাড়ায় অমন রং ঢের মিলে।" তিনি বলিতেন—"কেমন নাক চোখ!" আমি বলিতাম—"কুমারবাড়ী ফরমায়েস দিলে এর চাইতে ভাল নাক-চোখ পাওয়া যায়।" তিনি বলিতেন—"কেমন গোলগাল নিটোল গড়ন!" আমি বলিতাম—"কলিকাতার যাদুঘরে অমন গড়ন

চের দেখিয়াছ।” তিনি বলিতেন—“কেমন কাল ঢেউ-খেলান চুল, পা পর্যান্ত নামিয়া আসে ; ঐ চুল এলো করে দাঁড়ালে, মনে হয় যেন মেঘের কোলে সৌদামিনী স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া আছে।” আমি বলিতাম—“লম্বা চুলেই যদি রূপ হয়, তবে সে রূপ চুলায় যা’ক্।” তিনি বলিতেন—“তুমি তারে দেখ্‌তে পার না, তাই তার চলন বাঁকা!” আমি বলিতাম—“সে আমার কোন্ পাকা ধানে মই দিয়াছে যে তাকে আমি দেখ্‌তে পার্‌ব না!” তিনি বলিতেন—“তবে তোমার চোখের দোষ আছে, নইলে অমন ভুবনমোহিনী রূপ দেখ্‌তে পাও না?” আমি বলিতাম—“চোখ না থাক্‌লে, এ মনোমোহিনীরূপে মজলাম কেমন করিয়া?” তিনি বলিতেন—“ঐ মজাতেই আন্ধা হয়েছ। জানই ত যার যাতে মজে মন। আচ্ছা, তোমার বন্ধুকেই জিজ্ঞাসা করিও, তিনি নলিনীর রূপের কথা কি বলেন।” আমি বলিতাম—“নলিনী যে তখন চোখ বুজে ছিল।” তিনি বলিতেন—“নগেন ত চোখ খুলেই দেখেছে।” আমি বলিতাম—“দেখেছে সে প্রতিমা।” তিনি বলিতেন—“সব বরই ত ঐ দেখে ভুলে। তুমিও ত তাই দেখেছিলে। সব কনেই ত চোখ বুজে থাকে।” আমি বলিতাম—“তা’তেই ত এত লোকে হীরা বলে কাঁচ কিনে।” তিনি বলিতেন—“রূপ কি যত ঐ পোড়া চোখের পাতাতেই লুকিয়ে ঢাকা থাকে?” আমি বলিতাম—“চোখের ভিতরে রূপের

প্রাণটা থাকে। দেখ্‌ছ না কি, নলিনীর রূপের শরীর আছে, প্রাণ নাই। নলিনী অপূর্ব্ব পুতুল, স্থন্দর ষ্ট্যাচু। কাঁটা কোম্পাস দিয়া মাপ্‌লে তার রূপ অতুলনীয়। কিন্তু প্রাণ দিয়ে বুঝ্‌লে শূন্য। নগেন এ বস্তু নিয়ে যে কি কর্‌বে বুঝি না। ঘর সাজাবার পক্ষে এ জিনিষ বেশ, কিন্তু এতে তিয়াস মিট্‌বে না।"

২

শেষে তাহাই হইল। বিবাহের পরে নগেন দেশের বিষয়-আশয় বিক্রী করিয়া কালীঘাটে গঙ্গাতীরে বাড়ী করিল।

বি,এ, পাশ করিয়া সে প্রথমে স্কুলমাষ্টারি আরম্ভ করে। পরে, এক সওদাগরী আফিসে বড় বাবু হয়। বেশ দু' পয়সা উপার্জ্জন করিতে লাগিল। বিবাহের পরে এসকলই নলিনীর সেবায় নিযুক্ত করিল। নলিনীকে যে কি করিয়া সাজাইবে, সে ঠিক পাইত না। মাসকাবারে মাহিয়ানা পাইয়াই তার অর্দ্ধেক দিয়া নলিনীর জন্য হয় ভাল ভাল কাপড়, না হয় নূতন নূতন গহনা-পত্র কিনিয়া আনিত। বাড়ীর পেছনে, গঙ্গার ধারে যুঁই, বেল, মল্লিকা, কত ফুলের কেয়ারী তৈয়ার করিয়াছিল, আর ঐ ফুল দিয়া প্রতিদিন নলিনীকে সাজাইত। কিন্তু তার সাজাইবার সাধ কিছুতেই মিটিত না। আর নলিনী নিতান্ত নির্লিপ্তভাবে স্বামীর এ সকল পূজা উপহার গ্রহণ করিত।

তাঁকে কোনও দিন ভাল কাপড় চোপড় পরিতে দেখি নাই। কখনও কখনও এজন্য আমরা নগেনকে কত তম্বি করিয়াছি। নগেন মুখ ভারি করিয়া বলিত, "বাক্সভরা ঢাকাই, বেনারশী, বোম্বাই, কিংখাব কত রকম-বেরকমের কাপড় আছে, না পরিলে করিব কি? চার পাঁচ হাজার টাকার গহনা দিয়েছি, কিন্তু সে কোনও দিন গায়ে তুলে না। নিতান্ত পীড়াপীড়ি করিলে, দু'এক দণ্ডের জন্য পরিয়াই আবার খুলিয়া রাখে। কেবল কোথাও নিমন্ত্রণে যাইতে হইলে যত পারে সাজগোজ করিয়া যায়।" ইহাতে নগেন আরও ব্যথা পাইত। সে চাহিত, নলিনী তার জন্য কাপড়-চোপড় পরিবে, তার জন্য সাজিবে গুজিবে। নলিনী বলিত—"ও আবার কেমন কথা? চৌপর দিন কি পুতুল সাজিয়া বেড়াইতে পারি? আর আমি ত তাঁর আছিই; স্বামীকে ভুলাবার জন্য সাজগোজ করিব না কি? আমি ত তাঁর রক্ষিতা নাই, যে সাজিয়া গুজিয়া তাঁর মন ভুলাইব? ছি! অমন সাজার মুখে আগুন!"

আমার গৃহিণী একদিন বলিলেন—"দেখ্ নলিনী, তুই কচ্ছিস্ কি? ও মানুষটা যে মরমে মরমে শুকিয়ে যাচ্ছে। তার যাতে সুখ হয়, তা করবি না? তোর পায়ে সর্ব্বস্ব ঢেলে দিচ্ছে, তুই দেখছিস্ না?" নলিনী নাক তুলিয়া, অসীম ঘৃণার সঙ্গে উত্তর করিল—"ও আবার কি কথা? সব স্বামীই ত

স্ত্রীকে যথাসর্ব্বস্ব দেয়। দেয় না কেবল মদো-মাতাল যারা। কিন্তু তাই বলে কি গৃহস্থের মেয়ে, দিনরাত স্বামীকে ভুলাবার জন্য বেশ্যার মতন সেজেগুজে থাক্‌বে, না তাদের মতন হাবভাব অভ্যাস কর্‌বে!" আমার গৃহিণী বলিলেন—"তুই এখনও পুরুষদের চিন্‌লি না?" নলিনী বলিল—"অমন পুরুষদের মুখে ছাই। অমন চিনারও মুখে ছাই।"—আমার গৃহিণী বলিলেন—"স্বামীর সেবা কি স্ত্রীর কর্ত্তব্য নয়?" নলিনী বলিল—"অবশ্য কর্ত্তব্য। স্ত্রী স্বামীকে খাওয়াবে দাওয়াবে, তাঁর ঘরকন্না দেখ্‌বে। ঠাকুর দেবতার পূজা কর্‌বে। অতিথি-অভ্যাগতের সেবা কর্‌বে। স্বামীর আত্মীয়কুটুম্বদের আদর যত্ন কর্‌বে। এই ত জানি। স্বামীর জন্য অপ্সরা সেজে বেড়াবে, নাচগান কর্‌বে, স্বামীর গা ঘেঁসে বসে সারা বেলা তাঁর মুখের পানে তাকিয়ে থাক্‌বে, গায়ে সাবান মাখ্‌বে, মুখে পাউডার ঘষ্‌বে, প্রহরে প্রহরে, কাপড় বদলাবে, আর সোনাদানা মুড়ে থাক্‌বে, অমন কথা ত শুনি নাই। ও সব তোমাদের নতুন বিলাতী ঢং, আমার ভাই ও সব ভাল লাগে না, আমি কর্‌ব কি? ও সব সখই যদি ছিল, উনি একটা মেমই বিয়ে কর্‌তে পার্‌তেন। বিলাতী মেম না পান, দিশী মেমও ত এখন মিলে। গৃহস্থের মেয়েকে বিয়ে করবার দরকার ছিল কি? হিন্দুর মেয়ে, স্বামীকে ভক্তি করে; আমি ওঁকে ভক্তি করি। হিন্দুর মেয়ে স্বামীর সেবা

করতে জানে, সে সেবায় যাতে আমার ত্রুটি না হয়, ঠাকুরের কাছে দিন-রাত তাই বলি। কিন্তু তুমি যাই বল, আমি বিবিও সাজ্‌তে পার্‌ব না, আর স্বামীর নিকটে বেশ্যাও সাজ্‌তে পার্‌ব না।" আমার গৃহিণী বলিলেন—"ভাল কাপড় চোপড় আর গহনা পরা কি কেবল বেশ্যারই ব্যবসা? তবে বেচারী তোরে এসব দেয় কেন?"

নলিনী—"দেন কেন, তিনিই জানেন। আমি লই এজন্য যে এগুলিতে দুর্দ্দিনে একটু আশ্রয় দিতে পার্‌বে। টাকাকড়ি ত কিছু দু'লাখ দশলাখ নাই। শ্বশুরঠাকুরের যা কিছু ছিল তাও ত বেচে ফেলেছেন। আছে এই কুঁড়েখানি। মানুষের শরীরের কথা ত বলা যায় না, কখন কি হয়। তবু আপদ-বিপদে এই গহনা কখানাতে কাজ দেখ্‌তে পারে। আর কাপড়-চোপড়? অত দামী কাপড় কেনেন, আমি কিছুতেই চাই না।"

আমার গৃহিণী বলিলেন—"তুই যাই বলিস্ না কেন, ও বেচারীর প্রাণটা চেপে মার্‌ছিস্। অমন সোণার মানুষ, তোর অনাদরে দিন দিন শুকিয়ে যাচ্ছে, দেখছিস্ না?"

নলিনী কোনও উত্তর করিল না। কিন্তু এমনি ভাবে তাঁহার মুখের দিকে চাহিল যে, তিনি শিহরিয়া উঠিলেন। বাড়ী আসিয়া আমায় বলিলেন—"এতদিনে তোমার কথা বুঝলাম।

সত্যই নলিনীর রূপ রূপই নয়, ও রূপ কেবল তার গড়নের, প্রাণের নয়।”

যাহা ভয় করিয়াছিলাম, নগেনের ভাগ্যে তাহাই ঘটিল। বছরখানেকের মধ্যেই নগেন বুঝিল যে যাহা খুঁজিয়াছিল তাহা পায় নাই; এ জিনিষ দিল্লির লাড্ডু। নগেন সদ্বিদ্বান্। নগেন ভাবুক। সে কবিতার বই ছাপায় নাই, কিন্তু প্রাণটা তার কবিতায় ভোরপুর ছিল। সে ভাবিয়াছিল, নিখিল বিশ্ব-বাসনার বস্তুটি তার ভাগ্যে জুটিয়াছে। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে নলিনীর রূপও আরও ফুটিয়া উঠিল। কিন্তু তাহা হইলে হইবে কি? নগেনের প্রাণের তিয়াস তাহাতে মিটিল না। দাম্পত্য-জীবনের কথা উঠিলেই সে বলিত—“ভায়া! ঐটিই সত্য মরীচিকা। জলাশয়ের মতন দেখায়, কিন্তু তাহাতে হাত দিয়া জল পাওয়া যায় না; শুষ্ক, উত্তপ্ত বালু; তালু শুকাইয়া যায়, ভায়া, তালু শুকাইয়া যায়।”

৩

তিন চার বৎসর পরে, হঠাৎ একদিন নলিনীকে দেখিয়া আমি চমকিয়া উঠিলাম। সে দিন দেখিলাম, তার ঐ অতুল রূপের নদীতে বান ডাকিয়াছে, জড় সৃষ্টিতে চৈতন্যের সাড়া পড়িয়াছে। সেদিন দেখিলাম, তার চোখ আর সে চোখ নাই।

যে দৃষ্টি আগে শূন্য ছিল, তাতে এখন বিদ্যুৎ চমকাইতে আরম্ভ করিয়াছে। যে মুখের চাঁপার মতন রং ছিল, কিন্তু সে রং লইয়া ক্ষণে ক্ষণে ভাবের খেলা খুলিত না; সে মুখ এখন ক্ষণে আরক্তিম, ক্ষণে পাংশু হইতে শিখিয়াছে; যে দেহ-গঠন, পাথরের মূর্ত্তির মত নিখুঁত, আর পাথরেরই মতন স্থির, শীতল ছিল, তাহাতে প্রাণের চাঞ্চল্য, পুলকের উষ্ণতা ফুটিয়াছে। দেখিয়া বিস্মিত হইলাম। নলিনী চলিয়া গেলে গৃহিণীকে জিজ্ঞাসা করিলাম—"নলিনীর হয়েছে কি?" তিনি ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া বলিলেন—"হবে আবার কি?" আমি বলিলাম—"অমন অদ্ভুত রূপ আসে কোথা হইতে?" তিনি বলিলেন—"এতদিনে তুমিও মজিলে? তা এসব আমার জানাই ছিল। এতকাল আমার খাতিরেই ত কেবল ওকে অমন কুৎসিত বল্‌ছিলে। এবারে মনের কথা বেরিয়ে পড়েছে। তা আমি তাতে ভয় করি না। এখন বন্ধুর বাড়ীতেই আড্ডা জমালে হয় না? একে স্বামীর অন্তরঙ্গ বন্ধু, তাতে কৈশোরের শিক্ষক। কেউ কোনও কথা কইবে না।"

আমি বলিলাম—"তোমার ঠাট্টা একটু রাখ। আমি যে অবাক্ হয়েছি। এ যে কোনও দিন কল্পনাও করি নাই। এ পাথরের প্রতিমা মানুষ হ'ল কিসে?" তিনি এবারে হাসিয়া বলিলেন—"তোমরা কি সবাই দিন-কাণা। দেখ্‌ছ না,

নলিনী পোয়াতী। তোমার মুখেই ত শুনেছি রূপ আর কিছু নয়, কেবল রসের প্রকাশ। কারও রূপ মাধুর্য্যের স্পর্শে — আরম্ভ করে; কারও বা বাৎসল্যে। নলিনীর রূপ বাৎসল্যের সাড়া পেয়েছে।"

আমি বলিলাম—"এতদিনে নগেনের প্রাণটা জুড়াতে চলিল।"

তিনি বলিলেন—"সে-কথা কে জানে?" আমি বলিলাম—"বল কি? নলিনীতে নগেন যে বস্তু খুঁজছিল, তাইত তাতে ফুটিতেছে। নগেনের আশা পূর্ণ হ'ল।"

তিনি বলিলেন—"তোমরা বিদ্যাবুদ্ধির যতই বড়াই কর না কেন, আমাদের চিন্‌তে ও বুঝ্‌তে, তোমাদের এখনও আরও অনেক জন্ম সাধন কর্‌তে হবে। তোমরা ভাব আমরা কেবল তোমাদেরই জন্য জন্মেছি, তোমাদেরই জন্য বেঁচে থাকি, তোমরা ছাড়া আমাদের আর কোনও সাধ, কোনও আশা, কোনও কিছু নাই। তোমরা জান না, তোমাদের জীবনটা যেমন নিত্য নূতন চায়, স্ত্রীলোকের প্রাণও তাই চায়। কেবল স্ত্রীকে নিয়ে তোমাদের যেমন সাধ মেটে না, আমাদেরও কেবল স্বামীকে নিয়ে মিটে না।"

আমি বলিলাম—"তুমি যে ভুঁইফোড় সফ্‌রেজিষ্ট হয়ে উঠ্‌লে!" তিনি বলিলেন—"ভিতরে ভিতরে সব স্ত্রীলোকই কমবেশী সফরেজিষ্ট্‌।" আমি বলিলাম—"কেবল তাই নয়, 'ফ্রি লভে'র

পাণ্ডা হলে যে!" তিনি বলিলেন—"সেটা না হয়, তোমাদেরই একচেটিয়া। তামসা ছেড়ে, সত্যি বলছি, তুমি কি ভাব কেবল পুরুষরাই নিত্য নূতন খোঁজে, স্ত্রীলোকের সে সাধ যায় না?" আমি হাসিয়া বলিলাম—"কৈ আমি ত নিত্য নূতন খোঁজে ছক্ ছক্ করে' বেড়াই না।" তিনিও হাসিয়া বলিলেন—"সে তোমার গুণ, না আমার বাহাদুরি? আমি যে নিত্য নূতন হয়ে তোমায় ভজনা করি। নইলে দেখ্‌তাম তোমার জারি-জুরি।" আমি বলিলাম—"এখানে আমারই হার হইল। কিন্তু কৈ আমি ত নিত্য নূতন হ'য়ে তোমার কাছে আসি না। তোমার দশা হয় কি?" তিনি বলিলেন—"অধিকাংশ স্ত্রীলোকের যা দশা, আমারও তাই।" আমি বলিলাম—"তোমাদের হেঁয়ালি বুঝতে পার্‌লাম না।" এমন সময় বারান্দায় ছোট ছোট পায়ের মলের শব্দ হইল। অমনি সমগ্র প্রাণটা চক্ষের ভিতর পূরিয়া দিয়া গৃহিণী দরজার দিকে চাহিয়া বলিলেন,—"ঐ যে আমার নিত্যি নূতন আস্‌ছে।"

আমি মুখ ফিরাইয়া গবাক্ষপথে আকাশ পানে চাহিয়া রহিলাম।

৪

ক্রমে নলিনীর দুইটি পুত্র ও তিনটি কন্যা জন্মিল। লোকে বলে যে, সন্তানধারণে স্ত্রীলোকের রূপযৌবন ভাঙিয়া

পড়ে। কিন্তু নলিনীর পক্ষে দেখিলাম উল্টা বিধান। মাতৃত্বের সূচনায় তার যে অপূর্ব্ব রূপ ফুটিতে আরম্ভ করিয়াছিল, ক্রমে একটির পর একটি করিয়া তার যেমন পুত্রকন্যা জন্মিল, ততই তার রূপ ও যৌবন যেন আরও ফুটিয়া উঠিতে লাগিল। আগে নলিনীর রং ছিল, গড়ন ছিল; কিন্তু প্রাণ ছিল না। রূপ ছিল, কিন্তু রস ছিল না। সন্তানবতী হইয়া তার মুখে, চোখে, দেহের অঙ্গপ্রত্যঙ্গে, এমন কি প্রতি লোমকূপ দিয়া যেন এক অপূর্ব্ব উজ্জ্বল রস-শ্রী ফুটিয়া বাহির হইতে লাগিল। সে যখন সন্তান কোলে লইয়া, আলুলায়িত কেশে, অর্দ্ধাবৃত বক্ষে, আসিয়া দাঁড়াইত, তখন তাহাকে সত্যই দেবীর মতন দেখাইত। আর যখন সন্তানকে বুকে করিয়া ঘুম পাড়াইত, তখন সেই সন্তানের কোমল দেহসংস্পর্শে তার সর্ব্বাঙ্গে অপূর্ব্ব পুলক ফুটিয়া উঠিত। সন্তানের দিকে যখন সে নির্ণিমেষ ভাবে চাহিত, তখন মনে হইত যেন বিশ্ব-সংসারের সকল প্রীতি, সকল মমতা, সকল কল্যাণ ও সকল কারুণ্য তার চক্ষু দিয়া ফাটিয়া বাহির হইতেছে।

প্রথম প্রথম এই মাতৃরূপ দেখিয়া নগেনও আপনার জীবন ও সংসারকে ধন্য মনে করিতে লাগিল। কিন্তু ক্রমে নলিনী প্রত্যেকটি সন্তানকে আপনার বাৎসল্যের আবরণে নগেনের নিকট হইতেও ঢাকিয়া রাখিতে লাগিল। নগেনের সঙ্গে ইহাদের কোনও বিশেষ ঘনিষ্ঠতা হয়, ইহা সে কিছুতেই সহিতে পারিত

না। নগেন চাহিত, ইহারা তার কাছে থাকে। এরাও কখনও কখনও বাবার ঘরে যাইয়া, তার বিছানায় ঘুমাইয়া পড়িত। নগেন তাদের বুকে পূরিয়া রাখিত। কিন্তু নলিনীর ইহা সহ্য হইত না। নগেনের গায়ের তাপে তার সন্তানদের ক্লেশ হইবে, নগেনের নিঃশ্বাসে তাদের স্বাস্থ্য নষ্ট হইবে, এই বলিয়া নলিনী তাদের তাড়াইয়া নিজের ঘরে লইয়া আসিত। কতদিন দেখিয়াছি, ঘুমন্ত শিশু বাপকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া আছে। আধ ঘুমঘোরে "বাবার কাছে শোব" "বাবার কাছে শোব" বলিয়া চিৎকার করিতেছে। কিন্তু নলিনী তাকে টানিয়া, হিঁচড়াইয়া, সেখান হইতে লইয়া গিয়াছে। নগেন কথা কহিত না, কিন্তু বুঝিতাম, তার প্রাণ যেন ফাটিয়া যাইতেছে। শুনিয়াছি, একদিন এই যাতনা এমনি অসহ্য হইয়া উঠিয়াছিল যে, নলিনী ছোট ছেলেকে নগেনের বিছানা হইতে জোর করিয়া তুলিয়া নিতে আসিলে, নগেন আত্মহারা হইয়া সেই ঘুমন্ত শিশুকে ছুড়িয়া বারান্দায় ফেলিয়া দিতে গিয়াছিল। সেদিন হইতে, অমন "রাক্ষুসে" বাপের কাছে তাদের আসা একেবারে বন্ধ হইয়া গেল।

নলিনী সন্তান লাভ করিল। সন্তানদিগকে পাইয়া তার রূপ ও রস অপূর্ব্বভাবে ফুটিয়া উঠিতে লাগিল। সন্তানদের মধ্যে সে আপনাকে একেবারে ডুবাইয়া দিয়া, জীবন সার্থক করিতে

লাগিল। কিন্তু নগেন এই সুধাসাগরের তীরে বসিয়া দিবানিশি কেবল হতাশার হলাহলই পান করিতে লাগিল।

সন্তানবতী হইবার পূর্ব্বে নগেন নলিনীর সেবাটুকু অন্ততঃ পাইত। ক্রমে সেটুকুও বন্ধ হইয়া গেল। এ পরিবারে সে যেন একজন অনাহূত ও অনাবশ্যক দায়ের মতন হইয়া উঠিল। সে একলা খায়, একলা শোয়। চাকরেরা দয়া করিয়া যদি তার বিছানা করে, তবেই তার বিছানা হয়। তারা যদি চাদর ও বালিশের খোল ধোপায় দেয়, তবে সেগুলি ধুইয়া আইসে। তারা যা না করে, নলিনী তা করে না। তারা যা না দেখে, নলিনীর তাহা দেখিবার অবকাশ হয় না।

এ সকল দেখিয়া সময় সময় আমার অসহ্য বোধ হইত। নলিনীকে কত সময় তিরস্কার করিতাম। কিন্তু সে তাহা গায়ে মাখিত না। আমার গৃহিনীও এজন্য তাহাকে কত বকিতেন। কিন্তু তার এক উত্তর ছিল—"আমি একেলা মানুষ, কোন্ দিক্ দেখি। আমাকেই বা কে দেখে ঠিক নাই। আর এ গুঁড়োদের যদি আমি না দেখি, দিদি, এরা যে অযত্নে মারা যায়। এরা আবার বাঁচবে এ আশা আমি করি না। তবু যদ্দিন আছে, তদ্দিন ত আর এদের না দেখে পারি না।" গৃহিনী নগেনের জন্য দুঃখ করিলে নলিনী বলিত,—"দিদি, ও তোমার বড় অন্যায় আব্দার।" এতদিন ত এই শরীরটা তাঁরই জন্য খেটে এসেছে।

এখন বুড়া হয়েছি, কচি গুঁড়োগুলোও হয়েছে। এখন আমাদের বুড়াবুড়ীর এদের জন্যই ত বাঁচা। নইলে মলেই ত হয়।” নলিনীর বয়স তখন সবে ত্রিশের কোটায় পড়িয়াছে।

দিন বসিয়া থাকে না। নগেনেরও দিন কাটিতে লাগিল। কিন্তু অযত্নে, অনাদরে, মনঃকষ্টে তার শরীর ভাঙ্গিয়া পড়িল। আমি মাঝে মাঝে বলিতাম—“নলিনী ত আর তোমাকে চায় না। সে ত নিজেই সংসার করিতেছে। তুমি আমার এখানেই এসে থাক না কেন?” নগেন বলিত, “সে কথা যে কখনও ভাবি নাই তা নয়; কিন্তু ছেলেদের জন্য প্রাণ যে কেমন করে। তাদের মুখ না দেখে কি থাকৃতে পার্‌ব?”

একদিন আমরা নগেনের বাড়ী যাইয়া দেখি, তার বিছানা-পত্র একেবারে ছেঁড়া ও ময়লা হইয়াছে। দেখিয়া আমার অসহ্য বোধ হইল। চাকরকে ডাকিয়া শাসন করিতে গেলাম। সে বলিল—“হুজুর, আমরা কি করিব? ধোপাবাড়ীর চাদর গিলাপ সব যে মা তাঁর ঘরে আট্‌কাইয়া রাখেন। সেগুলি আমাদের ছুঁইবার হুকুম নাই।” আমি বলিলাম—“আচ্ছা, আমি এর ব্যবস্থা করিতেছি। আমি নতুন লেপ তোষক মশারি সব পাঠাব, দেখিস্, সেগুলি যেন তোর জিম্মায় থাকে। বেটা মুনিবের প্রতি

কি তোর একটুও মায়া হয় না ?" এমন সময় নলিনী আসিয়া উপস্থিত হইল। আমি বলিলাম—"নলিনী, নগেন এই মুর্দ্দাফরাসের বিছানায় শুইয়া থাকে, তুমি কি দেখ্‌তে পাও না ?" নলিনী মুখ ভারি করিয়া বলিল—"আমি একটা ছেঁড়া মাহুরে পড়ে রাত কাটাই সে খবরই বা রাখে কে ? আর দাদা, এই গুঁড়ো ক'টি আপনাদের আশীর্ব্বাদে যদি বেঁচে থাকে, সে আশা ত আমি করি না। যদি আপনাদের কল্যাণে বেঁচে মানুষ হয়ে উঠে, এখন আমাদের ত তাই দেখ্‌তে হয়। নিজেদের ভোগবিলাসের দিন আমাদের ফুরিয়েছে, যেখানেই হউক রাত কাটিলেই হ'ল। যদি গুঁড়োকটি বেঁচে থাকে, তাদের জন্যও ত দু'পয়সা রেখে যেতে হবে। আপনার মতন ত অগাধ টাকা নাই। কলকাতার সহরে দুশ আড়াইশ টাকা কি আবার টাকা ! ডাইনে টান্‌তে বাঁয়ে কুলায় না। কোন্ দিক্ রক্ষা করি বলুন ?"

আমি পরদিনই নগেনের জন্য এক প্রস্ত বিছানাপত্র পাঠাইয়া দিলাম। নলিনী জান্‌তেও পার্‌লে না, কে পাঠাইয়াছে। সে ভাবিল, নগেন নিজেই বুঝি কিনিয়াছে। সপ্তাহখানেক পরে, গিয়া দেখি, নগেনের যে মুর্দ্দাফরাসের বিছানাপত্র ছিল, তাহাই রহিয়াছে। চাকরকে ডাকিয়া তদ্বি করিতে গেলাম। সে বলিল—"হুজুর, আমি বাবুর বিছানায় সেগুলি পেতেছিলাম। দুদিন মা কোনও সন্ধান পান নি। তিন দিনের দিন সেগুলি

কেড়ে নিয়ে বড় খোকাবাবুর বিছানায় পাতিয়েছেন। আমি কি করিব হুজুর! বাড়ীর কর্ত্তা ত আমি নই।"

সেদিন হইতে আমরা নগেনের বাড়ী যাওয়া একরূপ ছাড়িয়া দিলাম। নগেনও আমাদের বাড়ী আসা বন্ধ করিল। কেন করিল, জানি না। প্রায় ছয় সাত মাস আর দেখা শুনা নাই। তারপর, হঠাৎ একদিন কাছারি হইতে আসিবার সময় নগেনকে তার আফিসের সাম্‌নে দেখিয়া শিহরিয়া উঠিলাম। শরীর একেবারে শুকাইয়া গিয়াছে, সে সুন্দর গৌরবর্ণ কান্তিতে কালি পড়িয়াছে, চোখ দুটো কোঠরে ঢুকিয়াছে, গণ্ডাস্থি উঁচু হইয়া উঠিয়াছে। গাড়ী থামাইয়া নগেনকে তুলিয়া তার বাড়ী লইয়া চলিলাম। যাইতে যাইতে শুনিলাম যে, কিছুদিন হইতে তার শরীর অত্যন্ত খারাপ হইয়াছে; প্রতিদিনই একটু জ্বর হয়। নিরনব্বই, সাড়ে নিরনব্বই পর্য্যন্ত উঠে। মুখে আদৌ রুচি নাই। হজম একেবারেই হয় না। তার সঙ্গে সঙ্গে একটু খুষ খুষ কাশিও দেখা দিয়াছে। বাড়ী পৌছামাত্র, নগেনের ছোট ছেলেটি আগ্রহভরে "বাবা কেমন আছ" বলিয়া তার হাতের ছাতাটি লইতে গেল। ছাতাটি রাখিয়া, নগেন যেই চাপকান খুলিয়া রাখিতে গেল, অমনি সে সেটিকে নিজের কাঁধে ফেলিয়া, জামাটি লইবার জন্য হাত বাড়াইল। এমন সময় নলিনী ছুটিয়া আসিল। "চাকর বাকর কি সব মরেছে যে এই কচি ছেলেকে এ সব কর্ত্তে হবে?

আর মিন্‌সেরও কি আক্কেল, ঘামে জব্‌ জব্‌ কচ্ছে, জামাটা আদর করে ছেলের হাতে না দিলেই নয়।" এই বলিয়া নগেনের কাপড় চোপড়গুলি ছেলের হাত হইতে কাড়িয়া লইয়া উঠানে ছুড়িয়া ফেলিয়া দিল। আমি যে ঘরের ভিতর দাঁড়িয়ে ছিলাম, নলিনী দেখিতেই পায় নাই। হঠাৎ আমার উপরে চোখ পড়াতে একটু অপ্রতিভ হইয়া বলিল—"দেখুন ত কি অন্যায়, আমাকে ডাকলেই ত হ'ত। আমি কি মরেছি! এই কচি ছেলেটার উপর এই বোঝা চাপান কি ভাল? এরা যদি মরে, ওঁর ত কিছু আস্‌বে যাবে না, যা সর্ব্বনাশ হবে আমারই।"

কথা শুনে আমার ইচ্ছা হ'ল—যাক্‌, সে কথা না বলাই ভাল।

দেখিলাম, নলিনী ধরিয়া লইয়াছে যে, নগেনের থাইসিস্‌ হইয়াছে। ইহাতে যে নগেনের জন্য তার ভাবনা হয় নাই, তা নয়। কিন্তু নগেনের ভাবনার চাইতে তার ছেলেপিলেদের ভাবনা শতগুণ বেশী হইয়াছে। নগেনের জন্য কবিরাজ ডাকাইয়া আনিয়াছে। ঔষধের ব্যবস্থা করিয়াছে। তার সেবাশুশ্রূষার জন্য আলাহিদা চাকর রাখিয়া দিয়াছে, কিন্তু পাছে ছেলেমেয়েরা নগেনের কাছে আসে, তার বিছানায় শোয়, তার কাপড়-চোপড় ছোঁয়, তার এঁটো খায়, এই ভাবনায় নলিনী পাগলের মতন হইয়াছে। ছেলেরা বুঝে না, তারা যখন তখন বাবার ঘরে আসে,

বাবা খাইতে বসিলে তাঁর পাতের কাছে আসিয়া বসিয়া পড়ে। বড় তিনটি 'বাবা, এটা খাও, ওটা খাও' বলিয়া পীড়াপীড়ি করে, ছোটটি বাবার পাতে খাবার লোভে ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া চাহিয়া থাকে;—আর নলিনী ভয়ে মরিয়া যায়। নগেনের যখন কাশিটা বড় বাড়িয়া পড়িল, তখন নলিনী বাহিরে তার খাবার ব্যবস্থা করিল। সেখানে ছেলেদের যাতায়াত বন্ধ করিল। ক্রমে এমন দাঁড়াইল যে, নগেন পথ্য পায় কি না পায়, তার খোঁজও আর কেউ লয় না। নগেনের সেবাশুশ্রূষার কথা তুলিলেই নলিনী বলিতে লাগিল—"নিত্য রোগী দেখে কে? নিত্য নাই দেয় কে?" স্বামীর জন্য আলাহিদা ব্রাহ্মণ রাখিয়াই সে যেন সকল দায় এড়াইল। সে ব্রাহ্মণ পাঁচ দিন আসে ত দুদিন আসে না। আর সে-ই বা বৈদ্যের ব্যবস্থামত সর্ব্বদা অমন সন্তর্পণে রাঁধিবে কেন? কবিরাজ নগেনকে লবণ খাইতে নিষেধ করিলেন, কিন্তু বামুন আলুনী রাঁধিতে জানে না বা নুন যে দিতে নাই ইহা মনে থাকে না। কাজেই নগেনকে হয় কুপথ্য না হয় উপবাস করিতে হয়। ক্রমে বেচারা ভাত ছাড়িয়া দিল। নিজে আফিস হইতে আসিবার সময় কিছু ছাতু কিনিয়া আনিত, তাই একটু চিনির সঙ্গে গুলিয়া পথ্য করিতে লাগিল। ছাতু যখন আর চলিত না, তখন মাঝে মাঝে আমার বাড়ী আসিয়া যত অপথ্য কুপথ্য করিয়া যাইত।

৫

শীত গিয়া বসন্ত আসিল। বসন্ত গিয়া গ্রীষ্ম ও গ্রীষ্ম গিয়া ক্রমে বর্ষা নামিল। কিন্তু নগেনের শরীর সারিল না। বর্ষার সঙ্গে বরং অজীর্ণ আরও বাড়িয়া গেল। তখন ডাক্তারী চিকিৎসা হইতেছিল। ডাক্তার তাহাকে ভাত রুটি ছাড়িয়া কেবল ফল খাইতে বলিলেন। বেদানা, কমলালেবু, বাতাবী লেবু ও আনারসই তখন তার খাদ্য হইল। একদিন নগেন খাবার সময় ছোট ছেলেটির হাতে এক টুক্‌রা আনারস তুলিয়া দিল। নলিনী তাহা জানিতে পারিল। আর রক্ষা আছে? তাহার শাবকের উপরে কেহ আক্রমণ করিলে বাঘিনী যেমন হয়, নলিনীও সেই-রূপই হইয়া গেল। সৌভাগ্যক্রমে ঠিক সেই সময়ে আমরা দু'জনায় সেখানে যাইয়া উপস্থিত হই, না হইলে সেদিন একটা কাণ্ড হইত। আমাদের দেখিয়া নলিনী মন্ত্রাহত সাপিনীর মতন মাথা হেঁট করিয়া কাঁপিতে লাগিল। আর নগেন একটিবার আমার মুখের দিকে তাকাইয়া, পাত ছাড়িয়া, বিছানায় যাইয়া উপুড় হইয়া ফুঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিল। নগেনকে আমার কাছে আনিয়া রাখিতে অনেক চেষ্টা করিলাম। নগেন কিছুতেই রাজী হইল না। শেষে একদিন বলিয়া ফেলিল, "তুমি বোঝ না, —আমায় মন্দ ভেব না, তোমার সুখে আমি চিরদিন সুখী হয়েছি;

কিন্তু তোমাদের দুটিকে পাশাপাশি দেখ্‌লে আমার প্রাণ আরও হুহু করে জ্বলে উঠে। আমি তোমাদের হিংসা করি, এমনটা তুমি কখনও ভাব্‌বে না, জানি। দারুণ পিপাসায় যে কাতর তার চক্ষের উপরে আর একজন অপর্য্যাপ্ত শীতল জল পান করিলে, তার হিংসা হয় না, কিন্তু পিপাসার জ্বালা আরও দ্বিগুণ জ্বলে উঠে না কি?"

সেদিন হইতে আমরা নগেনের বাড়ী যাতায়াত করা আবার বন্ধ করিলাম; তারপর আমারও ভারি অসুখ হইল। মাসাধিক-কাল জীবন-মৃত্যুর সন্ধিস্থলে ছিলাম। একটু সারিয়াই ডাক্তারের হুকুমে পুরী চলিয়া গেলাম।

৬

আমার সুস্থ ও প্রকৃতিস্থ হইতে প্রায় আট নয় মাস লাগিল। যখন বেশ সারিয়া উঠিয়াছি, কলিকাতায় ফিরিবার কথা-বার্ত্তা হইতেছে, তখন একদিন বৈকালবেলা গৃহিণী এই দশ এগার মাসের সঞ্চিত চিঠিপত্রাদি আনিয়া দিলেন। প্রথমেই তিনি নগেনের নাম করিয়া এক তাড়া কাগজ-পত্র আমার সামনে রাখিলেন। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, এতে কি আছে? তিনি বলিলেন—পড়িয়াই দেখ। সকলের উপরকার চিঠিখানি পড়িয়া দেখিলাম, সেখানি ইংরাজিতে। নগেনেরই হস্তাক্ষর। পড়িলাম—

"My dear Haridas,

I did not tell you so long that, more than six months ago, I had created a Trust for the benefit of my children. The Trust property includes my two brick-built houses, (one in Calcutta and the other where my family resides at Kalighat) and the sum of ten thousand rupees, that I have in fixed deposit with my Bankers, and any other sum that I may from time to time put as part of this Trust in my Bank. I had rupees five thousand and odd on my account in the Provident Fund of Messrs. Thomson and Holland, which I have withdrawn this day, having resigned my office in tha Firm. Mr. Holland, the head of our Office, has kindly undertaken to send this sum to you. Kindly put this in the Trust-Fund, of which I have appointed you as the sole Trustee. I am confident, you will not refuse to accept this burden, which I ask you to do for the sake of my children. My attorneys have been instructed to send you a copy of the Trust-Deed, and place themselves at your disposal in the matter of this Trust.

Yours affectionately,
Nagendra Nath Ray.

চিঠিখানা পড়া হইলে, জিজ্ঞাসা করিলাম,—"নগেন কাজ ছেড়ে কর্‌ছে কি?" তিনি বলিলেন—"সেদিন হইতে সে নিরুদ্দেশ। তোমার তখন ঘোরতর বিকার; নলিনী আমাকে এই চিঠিখানা পাঠায়।" এই বলিয়া তিনি নলিনীর চিঠিখানা পড়িলেন—

শ্রীচরণেষু,

দিদি, আজ তিন দিন ছোট খোকার অসুখ। জ্বরে বেহুষ হয়ে পড়ে আছে। কিন্তু এই তিন দিন ওঁর খোঁজখবর নাই। তোমার ওখানে বেশ আরামে খেয়ে দেয়ে ইয়ারকি দিচ্ছেন, আর ছেলেটিকে ডাক্তার দেখায় কে, তার খবর নাই। মার প্রাণ কি অমন করে এক মুহূর্ত্ত স্থির থাক্‌তে পারে! এদের বাপ না থাক্‌লে আলাদা কথা ছিল। কত ছেলের ত বাপ নাই, ভগবান্ তাদের ব্যবস্থা করেনই করেন। কিন্তু, 'আছে গোরু না বয় হাল, তার দুঃখু চিরকাল'। আমারও সেই দশা হয়েছে। আমি তাঁকে আস্‌তে বল্‌ছি না। কিন্তু ছেলের প্রতি ত কর্ত্তব্য আছে।

সেবিকা—নলিনী।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম,—তারপর? গৃহিণী বলিলেন—"তোমার কাছে ডাক্তার বাবুকে বসিয়ে রেখে আমি তখনই গেলাম। গিয়ে দেখি, ছেলের জ্বর নাই।" "নগেন?" "ঠাকুরপোকে পাঠিয়ে খোঁজ নিয়ে জানলাম, তিনি চাকরী ইস্তাফা

দিয়ে, কোথায় চলে গেছেন কেউ জানে না। পরদিন তোমার নামে এই চিঠিখানা আসে।”

খুলিয়া পড়িলাম—

“আমার শরীরের অবস্থা জান। ডাক্তারেরা যাই বলুক না কেন, আমি বুঝিতেছি, দিন ফুরাইয়াছে। আর বাঁচিয়াই বা সুখ কি? সুখ না হউক, মানুষ আশাতেও বাঁচিয়া থাকিতে চায়। কিন্তু আমি যেথানে আছি, তার দরজায়, দাঁতের Inferno’র কথাগুলি যে আগুন দিয়া বিধাতাপুরুষ আঁকিয়া দিয়াছেন। ছেলেপিলেদের পেয়ে প্রাণে নতুন আশা জেগেছিল, আর তাদের মায়াতেই এত দিন পড়িয়াছিলাম। কিন্তু তুমি ত জান, তাদের পক্ষেও এই কাল ব্যারাম আমাকে একেবারে বাতিল করিয়াছে। তবে কোন্ সাধে আর কেবল উৎপাত বাড়াইবার জন্য এ সংসারে পড়িয়া থাকিব! আমার প্রাণের কথা কেউ জানে না, এ মর্ম্মের ব্যথা কাকেই বা বুঝাই? এই দেড় বছর কাল কি একাকিত্বের মধ্যে কাটিয়াছে, তোমরা কেউই জান না। দুপুর রাত পর্য্যন্ত বারান্দায় দাঁড়াইয়া পথের লোক গুণিয়া কাটিয়াছে। মুটে মজুর, মেথর ধাঙ্গড়, ঝি চাকর, যেই ওপথে যাইত, তাহাকেই আমা অপেক্ষা ভাগ্যবান্ মনে হইত। পথের স্ত্রীলোকগুলোকে দেখে ভাবতাম্ ওদের স্বামীরাও কত না সুখী! কত দিন মনে হইয়াছে, দূর হোক, এ মান ও চরিত্রের

যশ নিয়া কি ধুইয়া খাইব! কত লোক ত এ তিয়াস মিটাবার জন্য হাটে বাজারে আরাম খুঁজে বেড়ায়। কিন্তু ছেলেমেয়েদের মুখ যখন মনে পড়ে, তখনই শিহরিয়া উঠিয়াছি। এখন শরীর ভাঙ্গিয়াছে। জীবনদীপ নিবু নিবু। চল্লিশ বছরেই এমন জরা আসিয়া ঘেরিল যে, সংসারের বাহির হইয়া পড়িলাম। তবে আর কেন? যেখানে দু-চক্ষু যায়, সেখানে চলিলাম। আমার সোদর নাই, আবাল্য তুমি আমার সোদর হইতে বেশী হইয়া আছ। তোমার হাতে ছেলেরা রইল। বৃথা আমার খোঁজ করিও না। করিলেও পাইবে না। যেখানে থাকি, যতদিন থাকিব, ততদিন আমি—

তোমারই নগেন।

পুঃ—আমার মৃত্যু-সংবাদ যদি কোন ঘটনাক্রমে পাও ভালই। না পাও দ্বাদশবৎসরান্তে যথাশাস্ত্র কুশদাহ করিয়া শ্রাদ্ধশান্তি করাইও।

সম্পূর্ণ।

আট-আনা-সংস্করণ-গ্রন্থমালা

য়ুরোপ প্রভৃতি মহাদেশে "ছয়-পেনি-সংস্করণ"—"সাত-পেনি-সংস্করণ" প্রভৃতি নানাবিধ সুলভ অথচ সুন্দর সংস্করণ প্রকাশিত হয়—কিন্তু সে সকল পূর্ব্বপ্রকাশিত অপেক্ষাকৃত অধিক মূল্যের পুস্তকাবলীর অন্যতম সংস্করণ মাত্র। বাঙ্গালাদেশে—পাঠকসংখ্যা বাড়িয়াছে, আর বাঙ্গালাদেশের লোক—ভাল জিনিসের কদর বুঝিতে শিখিয়াছে; সেই বিশ্বাসের একান্ত বশবর্ত্তী হইয়াই, আমরা বাঙ্গালা দেশের লব্ধপ্রতিষ্ঠ কীর্ত্তিকুশল গ্রন্থকারবর্গ-রচিত সারবান্ সুখপাঠ্য, অথচ অপূর্ব্ব-প্রকাশিত পুস্তকগুলি এইরূপ সুলভ সংস্করণে প্রকাশিত করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম। আমাদের চেষ্টা যে সফল হইয়াছে, 'অভাগী' ও 'পল্লী-সমাজের' এই সামান্য কয়েক মাসের মধ্যে চতুর্থ সংস্করণ এবং ধর্ম্মপাল, বড়বাড়ী, কাঞ্চনমালা, দূর্ব্বাদল ও অরক্ষণীয়ার দ্বিতীয় সংস্করণ ছাপিবার প্রয়োজন হওয়াই তাহার কারণ।

বঙ্গদেশে যাহা কেহ ভাবেন নাই, শুনেন নাই, আশাও করেন নাই। সমগ্র ভারতবর্ষে ইহা নূতন সৃষ্টি! বঙ্গসাহিত্যের অধিক প্রচারের আশায় ও যাহাতে সকল শ্রেণীর ব্যক্তিই উৎকৃষ্ট পুস্তক পাঠে সমর্থ হন, সেই মহা উদ্দেশ্যে আমরা এই অভিনব 'আট আনা সংস্করণ' প্রকাশ করিয়াছি। মূল্যবান্ সংস্করণের মতই কাগজ, ছাপা, বাঁধাই প্রভৃতি সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর। মফঃস্বল-বাসীদের সুবিধার্থ, অপ্রকাশিত গুলির জন্য নাম রেজেষ্ট্রি করা হয়; যখন যেখানি প্রকাশিত হইবে ভিঃ পিঃ ডাকে ॥৵৹ মূল্যে প্রেরিত হইবে। প্রকাশিত গুলি একত্রে লইতে হয়, বা পৃথক পৃথক সুবিধামত পত্র লিখিয়াও লইতে পারেন। এই গ্রন্থমালায় প্রকাশিত হইয়াছে—

অভাগী (৪র্থ সংস্করণ)—শ্রীজলধর সেন।

ধর্ম্মপাল (২য় সংস্করণ)—শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়।

পল্লীসমাজ (৪র্থ সংস্করণ)—শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।
কাঞ্চনমালা (২য় সংস্করণ)—শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী।
বিবাহবিপ্লব (২য় সংস্করণ)—শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত এম্‌-এ, বি-এল্‌।
চন্দ্রনাথ—(২য় সংস্করণ) শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।
দুর্ব্বাদল (২য় সংস্করণ)—শ্রীযতীন্দ্রমোহন সেন গুপ্ত।
বড় বাড়ী (২য় সংস্করণ)—শ্রীজলধর সেন।
অরক্ষণীয়া (২য় সংস্করণ)—শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
ময়ূখ—শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম, এ।
সত্য ও মিথ্যা—শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল।
রূপের বালাই—শ্রীহরিসাধন মুখোপাধ্যায়।
সোণার পদ্ম—শ্রীসরোজরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় এম, এ।
লাইকা—শ্রীমতী হেমনলিনী দেবী।
আলেয়া—শ্রীমতী নিরুপমা দেবী।
বেগম সমরু (সচিত্র)—শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।
মকরু পাঞ্জাবী—শ্রীউপেন্দ্রনাথ দত্ত।
বিল্বদল—শ্রীযতীন্দ্রমোহন সেন গুপ্ত।
হালদার বাড়ী—শ্রীমুনীন্দ্রপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী।
মধুপর্ক—শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়।
লীলার স্বপ্ন—শ্রীমনোমোহন রায় বি-এল।
দুঃখের ঘর—শ্রীকালীপ্রসন্ন দাসগুপ্ত
মধুমল্লী—শ্রীমতী অনুরূপা দেবী।
রাণির ডায়েরী—শ্রীমতী কাঞ্চনমালা দেবী।
ফুলের তোড়া—শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী।

ফরাসী বিপ্লবের ইতিহাস—শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ঘোষ।

সীমন্তিনী—শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বসু।

নব্য-বিজ্ঞান—অধ্যাপক শ্রীচারুচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, এম্-এ।

নববর্ষের স্বপ্ন—শ্রীসরলা দেবী

নীলমাণিক—রায় সাহেব শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন বি, এ।

হিসাব নিকাশ—শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত এম, এ, বি, এল্।

মায়ের প্রসাদ—শ্রীবীরেন্দ্রনাথ ঘোষ।

ইংরেজী কাব্যকথা—শ্রীআশুতোষ চট্টোপাধ্যায় এম, এ।

জলছবি—শ্রীমণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় (যন্ত্রস্থ)

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স্—
২০১ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা